

জল-বনের কাব্য

সরলা বসু

এ-গ্রন্থের রচনাকাল : ১৯৫৭

প্রকাশক
মনোরঞ্জন মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন
৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড
৯ এ্যান্টনী বাগান লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দাম। চার টাকা

আমার এ-রচনার যিনি প্রথম প্রেরণা
সেই শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্মৃতির উদ্দেশে-

কৈশোর রঙের তুলিকায় যে-ছবি এঁকেছিলাম বুকে, তার কতোটুকু ছাপ দিতে পারলাম-না-পারলাম জানিনে, তবুও আঁকলাম স্মৃতির রেখায় প্রাণের ছবিখানি।

সাত-নদীর মোহানা

এক আষাঢ়ের সন্ধ্যায় পাঁজিয়া গ্রামের শেষে ধলাইতলা শ্মশান ঘাটে এসে নৌকায় উঠলাম।

এগারো বছরের মেয়ে। স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছি সুন্দর বনে। স্বামী সুন্দরবনে ফরেস্ট আপিসে কাজ করতেন।

আমার পালকি যখন আমায় তুলে দিয়ে গেলো তখন বেশ আঁধার হয়ে গেছে। দূরে তেপান্তর বিলের পারে চুয়াডাঙা-কৃষ্ণনগর গ্রামে আলেয়ার মতো আলোগুলি জ্বলছে। শ্মশানের ধারের প্রাচীন ঝাউগাছটি জোনাকি ও বর্ষার জলে ভারাক্রান্ত। কয়েক ফোঁটা জল ও শাঁ-শাঁ বাতাসটুকু মায়ের অশ্রু, দীর্ঘশ্বাসের মতো বিদায় মুহূর্ত বেদনাতুর করে তুলেছিলো।

আমাদের নৌকা ছেড়ে দিলো। সঙ্গে স্বামী ও আমার একমাত্র দাদা। দাদা যাবেন বাগেরহাটে। ওখানে দিদির বাড়ি থেকে লেখাপড়া করতেন।

অনেক রাত্রে বুড়ুলির বাঁধের পারে আমাদের নৌকা থামলো। নৌকা 'উফোস' দেওয়া হবে। মানে বাঁধের উপর দিয়ে শুকনো মাটিতে নৌকা টেনে জলে নামাবে।

উফোস দিলো আমাকে সুদ্ধ। বেশ গাড়ি চ'ড়ে নেমে গেলাম।

মা-বাবাকে ছেড়ে অচেনা মানুষের সাথে চলেছি অকূলে। শুধু কান্না পেতে লাগলো। শুধু কান্না। দাদাকে জড়িয়ে দাদার কোলে কখন ঘুমিয়ে গেলাম জানিনে।

ঘুম যখন ভাঙলো নৌকা নোঙর দেওয়া ভদ্র নদীর মধ্যে।

উপরে ডুমুরিয়ার বড় হাট। এই হাটে অনেক জায়গার লোকজন, জিনিস-পত্রের সমাগম হয়।

দূরে হরতি-তি—হরতি-তি—পাখি ডাকছে। ভোরের রৌদ্রে নৌকাখানি ঝলমল করছে।

বে-গোণ; তাই রান্না করে খেয়ে নেওয়া হবে এখানে। দাদা, স্বামী, মাঝিরা সবাই উপরে চলে গেলো। আমি একা নৌকায়। দাদা আমাকে একহাঁড়ি রসগোল্লা দিয়ে খেতে বলে গেলো। আমি নৌকার বাইরে বসে জলে পা ঝুলিয়ে দিয়ে খেতে শুরু করলাম।

খেতে খেতে দেখি এক ঝাঁক কাঁকলাস মাছ। ওদের একটি রসগোল্লা ছড়িয়ে দিলাম। আর যায় কোথা। ঝাঁকে ঝাঁকে ট্যাংরা-চিংড়িরা এসে গেলো। কী মজা! রস নিংড়ে-নিংড়ে যতো ছড়িয়ে দিই ওরা লাফালাফি করে ততো খায়। খুব খায়। এক হাঁড়ি সব শেষ। মাত্র থাকলো দু'টো।

নিচু হয়ে যেমন হাত ধুতে গেছি, অমনি কাঁঠালের ব্যাপারী-নৌকা থেকে একটা লোক চেঁচিয়ে উঠলো, 'খুকি, ওঠো, ওঠো, এখুনি কুমিরে নেবে। এর নাম ভদ্র নদী। এতে শুধু কুমির।'

আর একজন বললো; ভদ্র নদী, মঙ্গলবার, দয়ার গুঁড়ো শুনতে খুব ভালো, গুণে যে সর্বনেশে।

ভদ্র নদীর গুণ কুমিরে ভরা। মঙ্গলবার শুভকর্মে ভালো না। দয়ার গুঁড়ো—একরকম ফলের গুঁড়ো, গায়ে লাগলে যেমন জ্বালা করে তেমনি ফুলে ওঠে।

একটু পরে দাদা স্নান সেরে এসে রসগোল্লা চাইলো। স্বামী ও দু'জনে খাবে। রসগোল্লা ওজনে ছিলো দু' সের। মাছেরা ও আমি সব খেয়ে ফেলেছি।

লজ্জা পেলাম। ওরা কিছুই বললো না। মা-বাবা ছেড়ে

চলেছি দূর দেশে ; আমাকে শান্ত করতে পারলে হয়, তাতে আবার কিছু বলা !

খাওয়া-দাওয়ার পরে গোণে নৌকা ছাড়লো। খানিকটা দূরে এসে জোয়ারের জলে একটা জায়গা ধসে গেছে। সেখানে একটা বড়ো কুমির শুয়েছিলো। আমাদের দেখে ঝপাং করে জলে পড়লো।

ভদ্র-নদীর চিহ্ন !

বিকেল হয়-হয়। কচিপাতা নদীতে নৌকা নামলো। সামান্য তরঙ্গায়িত মাঝারি নদী। কতো গ্রাম, মুচি পাড়া, দারোগার বোট, পুলিস সাহেবের স্টীমার দেখতে দেখতে যাচ্ছি।

সন্ধ্যায় রূপসাতে নৌকা নামলো। একটি গ্রাম। নদীর ধারে গোহালে সাঁজাল দিচ্ছে। গ্রাম্য বধূ প্রদীপ জ্বালাচ্ছে। কতগুলো গোরু জোয়ারের জলের মধ্যে জলো লম্বা-লম্বা ঘাস খাচ্ছে তখনও।

হঠাৎ ঢেউয়ে নৌকাখানা নাচতে লাগলো। চটপট শব্দ হতে লাগলো। স্টীমার যাচ্ছে। খুলনা নিকটে। খুলনায় মামাশ্বশুরের বাসায় উঠতে হবে।

সন্ধ্যা-বধূ ধূসর শাড়ি পরে তুলসীতলায় যখন মাথা নোয়ায় আমাদের নৌকা ভিড়লো কয়লাঘাটায়। ছেলেরা বৈকালীন নৌকাবিহার থেকে ফিরছে জল ছড়া-ছড়ি করে। কতো ছেলেরা নৌকায় 'বাচ' খেলছে। বাঁশী বাজাচ্ছে, গান করছে। চিক্‌চিক্ করছে বাতাস-লাগা জল। স্নিগ্ধ সন্ধ্যার অপূর্ব সমাবেশ। উপরে একটা বটগাছ লাল টুকটুকে ফলে ভরা। পাখিরা কিচির-মিচির করে উড়ে-উড়ে খাচ্ছে। জানি না ওরা এখানে দিনের কি রাত্রেরও অতিথি।

আর আসছে রাস্তার পারে একটা লাল লম্বা দালান থেকে

গানের মতো সমবেত কণ্ঠের সুর। বড় ভালো লাগলো। শুনলাম মিশনারী পাদরী সাহেব বাঙালী খ্রীষ্টানদের উপাসনা করাচ্ছেন। তখন গ্রামে-গ্রামে ঘুরে পাদরীরা বহু লোককে খ্রীষ্টান করতো।

কয়লাঘাটার উপর মামাশ্বশুরের বাসা। নতুন বউ। অনেক আদর-যত্ন পেলাম এখানে। রাত্রে ওখানেই থাকলাম। সকাল বেলায় আবার নৌকা ছাড়লো।

এবারও সেই লাল দালানের উপাসনার সুন্দর সুর শুনতে শুনতে চললাম। ইলিশ মাঁছ ধরছে মাঝ নদীতে। আগের দিন কাচি-পাতার মুখে ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টিতে এক রকম সুতোর গুটির মতো কি জলে ফেলে ইলিশের সন্ধান করছিলো। আজ দেখলাম, এক রকম তিন কোনা জাল দিয়ে মাছ তুলছে। গহীন জল থেকে ইলিশ তোলা মাত্রই জীবনের সন্ধান মেলে না। রৌদ্রের আলোয় জালের ভেতর রুপোলী ইলিশদের মনে হচ্ছে যেন হীরক-রেখা রাজকন্যারা ঘুমিয়ে আছে প্রাসাদের জালিকাটা বাতায়নে।

নৌকা চলেছে। নদীর ধারে সুন্দর একটি বাড়ি দেখলাম। জলের ঢেউ যাচ্ছে দরদালানে। রোয়াক গেছে নদীর মধ্যে। দোতলা বাড়িখানি শুনলাম খানকার চাটুজ্যেদের। খানাকুলের জমিদার ওরা। অবশ্য ও বাড়িতে কেউ থাকে না। কয়েকদিন পরে তো জলের রাজবাড়ি হবে।

নৌকা ঢুকলো আলাইপুরের ভৈরব খালে। আয়তনে এত ছোটো, মাত্র একখানা নৌকা যেতে পারে। ভৈরব মরে এখানে ছোটো হয়ে গেছে।

দুপুরবেলা ঘাটভোগ গ্রামে আমাদের নৌকা বাঁধা হলো। ওখানে মামীশাশুড়ীর বাপের বাড়ি উঠতে হবে।

দিদিশাশুড়ী ছোট্ট আমায় নৌকা থেকে কোলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর একজন বড় আদর করেছিলেন—স্বামী

পরিত্যক্তা রূপহীনা কালো মেয়ে শশীমাসিমা, মামীশাশুড়ীর বোন।

চান করালেন তিনি। আমাকে হাতে করে খাওয়ালো একটি আমার মতো ছোটো বউ। তার গায়ে ভর্তি সোনার গহনা। কোমরের সোনার কাঁকড়া-বিছে থেকে টায়রা-টিকলী পর্যন্ত। চব্বিশ টাকা সোনার ভরি, তায় গয়না পরবে না কেন?

এবারেও আমায় কোলে করে নৌকায় তুলে দিয়ে গেলেন ওঁরা। তখনকার সময়ে ছোটো নতুন বৌকে শাশুড়ীরা কোলে না করলে আদর করা হতো না।

সরু খালের মধ্যে নৌকা চলেছে। দেখতে দেখতে যাচ্ছি। দু'ধার। কতো গোরু চরছে। স্কুল, মানসার জাগ্রত কালীবাড়ি, শ্মশান। কতো ছোটো-ছোটো সমাধিস্তম্ভ—গায়ে মৃতের নাম লেখা।

বিকেলবেলা রাজপাট গ্রামের ঘাটে নৌকা ভিড়লো। ওখানে স্বামীর সরকারী মাঝি-মাল্লাসহ বড় বোট 'পান্না' নোঙর করা ছিলো। বোট পান্না মোটা-সোটা বাঙালিনী মেয়ে।

এখন আর লোকজন খাওয়া-থাকার অসুবিধা থাকলো না। মস্ত বড় বোট। পাঁচজন বোটম্যান, মাঝি। ওখান থেকে আর একজন লোক নেওয়া হলো। বয়সে প্রবীণ। নাম অক্ষয়। রান্নাবান্না করবে আর আমাকে দেখবে শুনবে।

লোকটি তো আমায় দেখেই অবাক্। এতটুক্ মানুষ, আমি হলাম ফরেস্টার বাবুর বউ। তায় যাচ্ছি খাস সুন্দরবনে কুমির-বাঘের মুখে।

সুন্দরবনের বাবুর বৌকে বোটম্যান, চাপরাশী, বাওয়ালী থেকে যে কোনো সাধারণ লোকেরা 'মা' বলে ডাকার নিয়ম। আর বনকরের বাবুদের তো রাজা-গজার মতো দেখে সবাই। মান-প্রতিপত্তির সীমা নেই।

অক্ষয় আমার কাছে সভয় কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলো, 'মা, আপনার মা নেই যেন?'

'হ্যাঁ, আমার মা-বাবা সবই আছেন।'

'আপনি জানেন না, উনি আপনার নিজের মা না।'

আমার সর্বশরীর যেন জ্বলে গেলো। নিজের মা না তো কাদের মা?

কোনো মা যে অতটুকু মেয়েকে জেনে-শুনে অকূল জল ও সীমাহীন বনদেশে পাঠাতে পারে এ ওর ধারণাতীত। ওর সুন্দরবনকে বেশ জানাই আছে। তখনকার মায়েদের ধারণা ছিলো, মেয়ে যখন বিয়ে দিয়েছি তখন সাবিত্রীর মতো স্বামীর সঙ্গে রণে-বনে যাবে।

শুনলাম বোটম্যানদের সঙ্গে ও খুব ফিস্‌ফাস্‌ করতে শুরু করেছে, 'অতো সুন্দর মেয়েটা, মা থাকলি কি এই জঙ্গলে পাঠাতো?'

বোটম্যানরা বলছে খুলনার ভাষায়, 'আহা, একেবারে ঝিবুত মানুষ, আহা!'

ওদের ভাব দেখে দাদা ও আমি খুব হেসেছিলাম সেদিন। তারপরে যে হাসির ওজনের চেয়ে কান্নার ওজন কতো ভারী হয়েছিলো তার ঠিক নেই।

আমি ঘুমিয়ে পড়লে কোন্‌ সময় নৌকা ছাড়লো জানি না। তারপর সকালে জেগে দেখলাম খাল বেশ নদীর আকার নিয়েছে।

দুপুরবেলা যাত্রাপুর রথের বাজারে নৌকা নোঙর করা হলো।

সেদিন ছিলো রথ। ওখানে খুব ভালো রথ হয়। দেশ-বিদেশের মানুষ আসে।

সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। সাজানো কাঠের রথ। নানা রকম

জিনিস-পত্রে রথের বাজার গম্‌গম্‌ করছে। কিন্তু জিনিস-পত্রের বেশ দাম।

তখন প্রথম যুদ্ধের যুগ। পয়সায় দুটো দেশলাই ছিলো, একটা হয়েছে। খয়ের দু'খানা ছিলো, একখানা হয়েছে। এমনি সব।

স্বামী আমার জন্য কতগুলো বেশি দাম দিয়ে জিনিস কিনলেন। একটা ক্যাশবাক্স, শেমিজ, পাখি-কাঁটা, বেলকাঁটা, ফিতে। আমার দিদির বাড়ি যাবো বলে বোনপোর-বোনঝির জন্য খেলনা কিনলেন অনেক। আর খাবার-দাবার কিনলেন যথেষ্ট। রথ, চিনির পুতুল, আনারস, জিলিপি, বাঙি, কাঁকুড়।

সন্ধ্যার আগেই বাগেরহাট গেলাম। বাগেরহাট ছোট্ট সাজানো একটুখানি শহর। বাগেরহাট থেকে দিদির বাড়ি দু'মাইল রাস্তা—কাঁঠাল গ্রামে। তখন মোটর তো দূরের কথা ওখানে ঘোড়ার গাড়িও ছিলো না।

দাদা আমাকে বুঝিয়ে বলে ডুলি আনতে গেলো। ডুলি কোনদিন দেখিনি। ডুলির অবস্থা দেখে কিছুতেই চড়লাম না। শেষ পর্যন্ত বোটের ছোটো ডিঙিতে একটা ছোটো খালের মধ্য দিয়ে, পানের বরজ ঠেলে ঠেলে কাঁঠালগ্রাম গেলাম।

রাত্রে দিদিমণির বাড়িতে দরজার পাশে একহাত ঘোমটা দেওয়া একটি বউ এসে দাঁড়ালো। গা ভরা গহনা। মুখ উঁচু করে আমার দিকে চেয়ে দেখছে। রঙটি যদিও কালো তবু বড় শ্রীমতী। কালোর অমন কোমল শ্রী আর দেখিনি। আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হবে। শুনলাম দিদিমণির ছোটো জা। বাপের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জে।

বঙ্গজ, বারেন্দ্র, দক্ষিণ রাঢ়ী, উত্তর রাঢ়ী সব শ্রেণীর কায়স্থকে একত্র করবার জন্যে এঁর ধনী বঙ্গজ বাপটি গরীব দক্ষিণ রাঢ়ীর ঘরে মেয়ে দিয়েছেন। সরল, সহজ মেয়েটি।

এই মেয়েটি কেন জানি এক মুহূর্তেই আমায় বড় ভালো বেসেছিলো। তার একমাত্র কাণ্ডারী বাপের বাড়ির ঝি-টিকে পর্যন্ত আমার সঙ্গে দিলো আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে।

একদিন থেকে, দুপুরবেলা সবাইকে ছেড়ে অজানা মানুষগুলির সাথে অজানা দেশে রওনা হলাম। দাদা বাগেরহাট পর্যন্ত দিয়ে চলে গেলো।

এইবার বুঝলাম নিজের অবস্থা। কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

নৌকা চলতে লাগলো। ভৈরব ক্রমেই বড় ও তরঙ্গায়িত হতে লাগলো।

বেলা শেষের রৌদ্র ছড়িয়ে পড়েছে নদীর বুকে। আকাশে আষাঢ়ের কাজল কালো মেঘ। কালো মেঘের ছায়া ঢেউয়ের সঙ্গে ওঠা-নামা করছে। মনে হচ্ছে, জলের মধ্যে কতো হাঙর, কুমির, কী ভয়ঙ্কর সব জীবজন্তু ভরা। দিদিমণির জা ভাতুদির বাপের বাড়ির ঝি শুয়ে আছে। তার নৌকা-রোগ হয়েছে। মাঝে-মাঝে বমি করছে। স্বামী লেখাপড়া করছেন। আর আমি অসহায় কান্না কাঁদছি।

নদীর ওপারে খেজুর বন। টেলিগ্রাফের তার চলে গেছে মোরেলগঞ্জের দিকে। অক্ষয় সস্নেহ কণ্ঠে ডাকলো, 'মাগো, কুটনো করে দিয়ে যাও।' আমার কথা মতো ও আমাকে তুমি বলতে শুরু করেছে। ওর স্নেহের আহ্বানে চোখ দিয়ে আরও জল পড়তে লাগলো। সমবেদনার অশ্রু। উঠে গেলাম।

সুন্দরবনের মধ্যে এখনও না ঢুকলেও হিংস্র বন্য নদী ভোলাকে পেলাম। বড় ঘোলা জল। বিনা বাতাসে ঢেউ উঠছে। খুলনা থেকে ওপারের টেলিগ্রাফের তারগুলি সাথী হয়ে এসেছে। ওদের বড় বন্ধু বলে মনে হতে লাগলো। একবার নদীর দিকে চাই।

ঝাঁপানো ঘোলা জল নৌকাখানি নাচিয়ে তুলছে। ভয়ে ওপারের তারের দিকে চাই। ওই টেলিগ্রাফের তার বেয়ে বেয়ে মনটা আমার চলে যায় খুলনায়। সেখান থেকে একলাফে মায়ের কাছে যেখানে মা কাঁথার ধামা নিয়ে পুঁটিপিসীর সঙ্গে গল্প করছেন।

সৎমা নয়তো কি? আমাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে বেশ আছেন। দুঃখে, অভিমানে চোখ ফেটে জল বেরোয়। শুধু কাঁদি। অক্ষয় ভুলিয়ে ডেকে নেয়। আর ঝি-টা কেবল খায় আর ঘুমোয়। স্বামীর সঙ্গে তো কথাই বলিনে ভয়ে।

নৌকা পরদিন বিকালে মোরেলগঞ্জ পৌঁছলো। মোরেলগঞ্জ বেশ বড় বন্দর। সুন্দরবন ও অন্যান্য জায়গা থেকে বেচা-কেনা হয় এখানে। এখানে দেখলাম সুন্দর-সুন্দর মাটির বাসন, কোথা থেকে আসে, তা জানিনে।

আষাঢ়ের বিকাল। ছড়া-ছড়া বৃষ্টি নামছে। আবার থেমে যাচ্ছে। অবেলায় লালচে রৌদ্রে হাসছে নারকোল গাছের ভিজে পাতা। এখানে নোনায় নারকোল গাছ প্রচুর জন্মায়।

আমাদের বাজার করে নেওয়া হলো এখান থেকে বড় রকমের। আবার 'জলকেটে' নেওয়া হলো পাঁচ-সাতটা কালো মেঠেয়। জলে, বাজারে বোট ভর্তি হয়ে উঠলো। জলকাটা মানে বড়-বড় মেঠেয় মিষ্টিজল পুকুর থেকে তুলে নেওয়া। বনের মধ্যে জল তো পাওয়া যাবে না। নোনা জলে ভাত তরকারি সেদ্ধ হবে না। তেতো হয়ে যাবে।

মোরেলগঞ্জ থেকে সারারাত নৌকা চললো। সকালে যখন ঘুম ভাঙলো ভোরের সোনা-রঙা রোদে ভরে গেছে নদীর বুক। টেলিগ্রাফের তার শেষ হয়ে গেছে মোরেলগঞ্জ থেকে। লোকালয়ের

চিহ্ন নেই আর। দু'পারে শুধু সবুজ বন। একটা নৌকাও চলছে না নদীতে। সামনে গতি-মুখর ভোলা। দু'পারে বন-শ্রেণী।

চলেছি। সামনে পেলাম একখানি জেলে নৌকা। কিনারে মাছ ধরছে। বন্য গাছের পত্রবহুল ডাল নুয়ে পড়েছে তাদের মাথার ওপর। মনে হচ্ছে যেন একটি গ্রাম্যনদীর ঘাট। পল্লীমেয়েরা জল নিতে আসবে এখন সড়কের মধ্য দিয়ে। এই গাছগুলির পরেই যেন কতো আম-কাঁঠালের বন। কতো বাড়ি। কতো ঘর। এ তো শুধু আমার ভ্রান্ত ধারণা।

জেলেরা মাত্র মাছ পেয়েছে কয়েকটি। কিন্তু নানা রকম সাপ ভর্তি তুললো একটি জাল। ঢোড়া, বোড়া—নামও জানিনে। ওরা তাদের ল্যাজ ধরে-ধরে জলে ফেলে দিলো। সতেজ সুচিত্রিত সাপগুলি দেখলে ভয় করে।

জেলেরা মাছ দিতে চাইলো। স্বামী নিলেন না অল্প পেয়েছে বলে। জেলেদের নিয়ম, বনকরের বাবুদের নৌকা দেখাতে হবে। মাছ দিতে হবে।

নির্জন নদীতে নৌকা চলেছে। বাম পারে দু'খানা টিনের চালের মাথা দেখতে পেলাম। শুনলাম কোন থানা। তবে নিকটে কোনো লোকালয় আছে।

দিন যাচ্ছে, রাত আসছে। নৌকা চলছে। খাই-দাই, ঘুমুই। নদীর নোনাজলে স্নান করি। চোখ জ্বলে যায়। মায়ের জন্য মন কেমন করে। কাঁদি। বোটের জানালা দিয়ে চেয়ে থাকি আর গলা-বাতাসা দিয়ে দু'টো-দু'টো ছোলার ডাল খাই।

মোরেলগঞ্জের বাজার ও জল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। মাছ, দুধ কিছুই খাই না। পাওয়া যাবে কোথায়? শুধু ঘি, ডাল-ভাত খাই। আর সুজি আর রুটি। তরকারী—পাকা মিঠে কুমড়ো,

আলু আর এক রকম চাল-কুমড়োর মতো গিমি বা ছাঁচিকুমড়ো; এই তিন রকম তরকারী সুন্দরবনের বাবুদের, বাওয়ালীদের সম্পত্তি। অনেকদিন থাকে বলে।

কোথাও জলের আঘাতে গাছগুলি ধসে পড়েছে জলে। হেলে পড়া বন্য ঝাউ শাঁ-শাঁ শব্দে জোয়ারের বাতাসে দুলছে। একটা শিঙ-ওয়ালা হরিণ জল খাচ্ছিলো বন ঝোপের ভেতর। দাঁড়ের শব্দে ছুটে পালিয়ে গেলো।

একটা ছোটো খালের মধ্যে নৌকা ঢুকলো। দু'পারে মাঠ। বুঝলাম লোকালয় আছে নিকটে। আবার নদীতে পড়তেই দেখতে পেলাম কাঠের অপূর্ব বাড়ি! তক্তার বেড়া, তক্তার পাটলাজ করা। দেড়-মানুষ-উঁচু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়। নিচে লম্বা ঘাস। জোয়ারের জল উঠছে। ঘরের চালা গোলপাতার ছাওয়া। শুনলাম ধানসাগর ফরেস্ট আপিস।

দুপুর বেলা স্বামী আপিসে খেলেন। আমার ভাত আপিসের বাবু নিজে ঠাকুরকে সঙ্গে করে নৌকায় দিয়ে গেলেন। খুব মাছ। ভেটকি মাছ চচ্চড়ি, বাগ্‌দা চিংড়ি ভাতে, টাটকা তেল দিয়ে ঝোল। খয়রা মাছ ভাজা। ডালেও ভেটকির মাথা। প্রচুর ঘন দুধ-বাতাসা।

ভাদুদির বাপের বাড়ির ঝি-টা বেশ চাট্টি খেয়ে খোস মেজাজে বললো, 'সুদুঁরবনে মাছ পাওয়া যায় তো বেশ!' অক্ষয় উত্তর দিলো, 'এ আবার মাছ নাকি? ভাদ্র মাস থেকে ফাগুন মাস পর্যন্ত মাছে-মাছে ছয়লাবি। কে কতো খাবে?'

আমি অনেক সময় অক্ষয়ের রান্না দেখতাম। ও নিচু গলায় ওর ছেলে-মেয়ে বাড়ির গল্প করতো। স্বামী যাতে না শুনতে পান এমনি ফিসফাস করে বলতো আমি কিছুই বুঝতে পারতাম না। শুধু ওর হাত-পা নাড়া, চোখ-মুখ টানা দেখে দুঃখেও হেসে

ফেলতাম। অবশ্য বার বার ও জানাতে ভুলতো না, আহা, মা থাকলি কি এমনি সোনার বাছারে বাঘ-কুমিরের মুখি পাঠাতো। তুখুনি দেখেই আমি বুঝিছিলাম।

নিজের বুদ্ধির তারিফে এমন একটা ভাব করতো হাসিতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতো।

আমি ওর কথা শুনেই যেতাম, কোনো মন্তব্য, আপত্তি করতাম না। মাঝে মাঝে ঝি প্রতিবাদ করতো! বলতো, 'আমি যে শুনেছি ছোটো সই-এর মা আছে।' ও আমাকে 'ছোটো সই' বলেই ডাকতো। তার কারণ আমার জামাইবাবুর আর ওর নাম একই। আমার দিদিমণিকেও সই বলতো।

অক্ষয় ওকে খেঁকিয়ে উঠতো, 'শুনা! ছাই শুনেছো, বলো দেখি, কী জানো?'

ঝি বেচারী বিশেষ কিছুই জানে না। কাজেই চুপ করে যেতো ওর হম্বি-তম্বি দেখে। ও বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বোটম্যানদের দিকে চেয়ে বলতো, 'আমার এ চুল বাইতি পাকেনি, বয়সেই পেকেছে। আমি এক কলম লিখে দিতি পারি, উনার মা নেই।'

জানিনে ওর লেখার বিদ্যে কতটুকু, রান্নার বিদ্যেই তো শুধু দেখেছি।

আবার একটা খালের মধ্যে নৌকা ঢুকলো। খালের একপারে ছোটো ছোটো ঝোপ-ঝোপ গাছ। অন্যপারে দিগ-দিগন্তহারা প্রান্তর। একটি গাছেরও চিহ্ন নেই। মাঝে-মাঝে ঘর কয়েক মানুষের বাড়ি, আবার কিছু দূরে কয়েকঘর। বেশ মজা দেখতে ফাঁকা মাঠের মধ্যে বাড়ির স্তূপগুলি। ফাঁকা মাঠের মধ্যে ধানসাগর ফরেস্ট আপিসের মতো একটি আপিস দেখা গেলো। শুনলাম শরণখোলা ফরেস্ট আপিস। এই শরণখোলায় থানা ও পোস্টাপিসও নাকি আছে।

নৌকা নোঙর করলো ওখানে। স্বামী ফরেস্ট আপিসে গেলেন বোটের ডিঙি চড়ে। একটু পরে ফিরে এলেন ওই আপিসের বাবুকে নিয়ে।

শরণখোলার বাবু বয়স্ক। ভদ্রলোকের নাম সীতিকণ্ঠ চক্রবর্তী। বেশ ভালোমানুষ। আমাকে দেখে স্বামীকে বললেন, 'এ তুই করেছিস কী! এ যে দুধের বাচ্চা। বাঘ কুমিরের মুখে কেন এনেছিস?'

স্বামী ওঁকে দাদা বলে ডাকতেন। উনি আমাকে বললেন, 'মা, তুমি আমার কাছে এখানে থাকো। ফিরবার সময় ও নিয়ে যাবে।'

ওঁকে যে কী ভালো লেগেছিলো আমার! মনে হলো যেন কতো আপনার জন। আনন্দে ওঁকে পাখা দিয়ে বাতাস দিয়ে দিলাম।

আমাদের সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে গেলেন; বাসায় উনি একাই ছিলেন। অবশ্য ঠাকুর-চাকর ছিলো।

ওঁর ওখানে সুন্দর একটি মিষ্টি জলের গোলপুকুর ছিলো। সেই পুকুর থেকে আমাদের চার-পাঁচ মেঠে জল নেওয়া হলো। যতোক্ষণ ওঁর ওখানে ছিলাম ওঁর পিছন-পিছন ঘুরছিলাম। বোটম্যানরা আশ্চর্য হয়ে দেখছিলো। সুন্দরবনের বাবুর বৌরা পর্দানসীন। ওদের ওরা কখনো দেখতে পায় না।

সকালবেলা স্বামী আবার আপিসে উঠে গেলেন। দু'বার হালুম-হালুম শব্দ হলো। আমি ভয়ে ঝিকে জড়িয়ে ধরলাম। অক্ষয় বললো, 'ভয় নেই মা। ও সুন্দরবনের সাহেবের স্টীমারের শব্দ। সাহেব এসেছেন।'

একটু পরে দেখলাম ছোটো ডিঙিতে শাদা রং ইংরেজসাহেব এলো শরণখোলা আপিস দেখতে। শুনলাম স্বামীর জন্য একখানা নতুন বোট এনেছেন স্টীমারে বেঁধে।

নদীর মধ্যে যেয়ে আমাদের বোট বদল করা হলো। বোট 'পান্না'কে ছেড়ে দিতে মনে বড় কষ্ট হলো। অনেকদিনের সাথী ও। যে নতুন বোট এলো এর নাম 'ওনা'। 'পান্না'র চেয়ে রূপসী। 'ওনা'র টিকালো শুভ্রশ্রী যেন একটি একহারা তরুণী ইংরেজমেয়ের মতো।

সীতিকণ্ঠবাবু আমাদের নতুন বোটে তুলে দিয়ে গেলেন। আমাকে বললেন, 'আবার যাবার বেলা এসো, মা। বাসায় মেয়েছেলে থাকলে তোমায় আমি যেতে দিতাম না অত জল-বনের মধ্যে।' স্বামীকে বললেন, 'বৌমাকে সাবধানে নিয়ে যাস। ছেলেমানুষ।'

ওঁর স্নেহটুকু সেদিন যে আমার কতো ভালো লেগেছিলো আজ তা ভাষায় ফোটাতে পারলাম না। যতক্ষণ ওঁকে দেখা গিয়েছিলো, চেয়ে ছিলাম।

আগের দিন বৈকালে যখন শরণখোলা আপিসের গোলপুকুর দেখি, সমস্ত গ্রামের মেয়েরা আমায় দেখতে এসেছিলো। তারাও আমায় ছোটো দেখে মমতা জানিয়েছিলো। গোলপুকুরের মিষ্টিজলের সন্ধ্যা-স্নিগ্ধ বাতাসটুকুর মতো ওদের সরল স্নেহটুকু এখনো ভুলিনি।

তারপর চললাম অজানা বন ও জলের রাজত্বে। সুন্দরী ওনা, আমার সঙ্গিনী ওনা আমার মতো শঙ্কাতুরা হয়ে উঠেছিলো বন্য ভোলাকে দেখে। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে বাতাসে, বৃষ্টির ছাটে শুধু পিছিয়েই আসছিলো, এগোতে পারছিলো না একটুও। আর ভোলা ওকে বুকে নিয়ে ঘোলা-ঘোলা ভয়াল ঢেউয়ে দোলা দিচ্ছিলো উচ্ছল আনন্দে। পিছন ফেরা ও দোলাতে সময় নষ্ট হলো বেশ। ওনার পিছনের ডিঙিটা বাতাসে আর জলের আঘাতে শব্দ করছিলো ছির্-ছির্-ছির্।

ভোলাকে পাড়ি দিয়ে কূলে-কূলে বোট যেতে লাগলো। বাতাসও কিছুটা কমলো। জন-মানবের সাড়া নেই। দেখছি শুধু জল, আর দেখলাম নদীর চর দিয়ে বহুদূর চলেছে কাজলা ধানের ক্ষেত। সুপুষ্ট নধর ধান-গাছগুলির মাথায় গাঢ় সবুজ মোটা-মোটা ধানের ঝুরি। ওরা বর্ষাস্নাত বাতাসে শির্‌শির্‌ করে দুলছে। অবাক্‌ হয়ে গেলাম। অক্ষয়কে জিজ্ঞাসা করতে ও বললো, 'ও ধান নয় মা, ও ধানসী। ওর ধানের মধ্যে কোনোদিন চালও হবে না, পাকবেও না। গোড়া দিয়ে শুধু গাছ হবে।'

একদম ধার দিয়ে যাচ্ছিল বোট। রান্না, ভাঁড়ার, বাথরুম, থাকবার ঘর, বোটম্যানদের জায়গা, ছাতের সি ড়ি, ছাত ও রেলিং দিয়ে ঘেরা, খড়খড়ি, পর্দা কোনোটার অভাব-অসুবিধা ছিলো না ওনা বোটে। দেখতে পেলাম সজ্জিত, সুন্দর গোলগাছগুলি। খয়েরি গোলফলের কাঁদিগুলি নুইয়ে পড়েছে জলে। কতগুলি গোলফলের কাঁদি আমাদের নেওয়া হলো। খেতে ঠিক তালশাঁসের মতো মিষ্টি। কেমন যেন বুনো গন্ধ। কেওড়া ওড়া হয়ে আছে গাছে-গাছে। গোল সবুজ ফল। খেতে খুব টক স্বাদ। হরিণরা কেওড়া ও কেওড়াপাতা খেতে খুব ভালোবাসে। এই কেওড়ার জন্য বানরে হরিণে খুব বন্ধুত্ব। বানর গাছে চ'ড়ে কিচির-মিচির ডাকে, হরিণরা কেওড়া পাতা, কেওড়া ফল খেতে জোট বেঁধে তলায় আসে। বানররা ফল পাতা ছিঁড়ে দেয়, হরিণ খায়। তাই তো সুন্দরবনের হরিণের মাংস টক।

অনেক শিকারী অমনি বানরের মতো কিচির-মিচির ডেকে ফল-পাতা ছিঁড়ে দেয়, ওরা না-জেনে খেতে এলে গুলি করে মেরে ফেলে। বনের গাছ, পাখি, মাছ, বাঘ, সাপ জীব-জন্তু সবারই রং ঘোরালো। মনে হয় উর্বরা ভূমির জন্য।

সুন্দর বনের প্রধান গাছ সুন্দুঁর, পশুর, আমুড়, গরান, কাঁকড়া,

কেওড়া ধোঁদল বাইন। অন্য খুচরো গাছ—লোহাগড়া, ভাতকাটি, শিঙড়ে, গেঁও, টক সুঁদুর প্রভৃতি। এই টক সুঁদুর বন খুব ছোটো ছোটো। নিবিড়। এর মধ্য দিয়ে বাঘ শিংওয়ালা হরিণকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, টক সুঁদুরের গাছে হরিণের শিং বেধে যায়, বাঘ তখন ধরে খায়।

এক-এক জায়গায় এক-এক রকম গাছের বন। মধ্যে-মধ্যে ওই টক সুঁদুর। অনেক রকম বন্যলতা। আর আছে এক মজার জিনিস, জোয়ারে জল-ওঠা কর্দমাক্ত বনভূমিতে প্রচুর শুলো। একরকম জীবন্ত পাতা-ডালশূন্য গাছ। উর্ধ্বে মোটায় আঙুলের মতো। মুখটা সুঁচোলো, গোঁজার মতো। পা দিলে আর রক্ষে নেই। শুলোকে ভয় করে না এমন জীবজন্তু, মানুষ নেই। মোটা জুতো পায়ে দিয়ে গেলে কতকটা নিরাপদ। খেজুর গাছের মতো আছে হেতাল গাছ। ওর মাথী খেজুরের মাথীর মতো খেতে লাগে। ফলগুলিও দেখতে খেজুরের মতো।

আমি লাল টুকটুকে কতোগুলি গেঁও গাছের পাতা ছিঁড়ে নিলাম। দেখতে বড় সুন্দর সিঁন্দুররঙা পাতাগুলি। কতোগুলি জেলে নৌকার সঙ্গে দেখা হলো। ওরা মাছ ধরে ফিরছে। প্রচুর ভেটকি, ভাঙান, কানমাগুর মাছ হাপর ভর্তি করে (জলের মধ্যে নৌকার পেছনে বাঁধা একরকম খাঁচার মতো জিনিস) নিয়ে চলেছে।

আমাদের অনেক মাছ দিলো ওরা। এক ডিঙির খোল ভর্তি করে জল দিয়ে রাখা হলো কানমাগুর মাছ। অনেকদিন জিয়োনো থাকবে। কানমাগুর খেতে মাগুর মাছের মতো। অনেকদিন মাছ খাওয়া হয়নি। খুব খাওয়া হলো। অভাব ঘটলো তরকারীর।

বনের ধার দিয়ে বোট যাচ্ছে। কোনো বিনা-পাসের বাওয়ালী নৌকা আছে কিনা দেখবার জন্য। মাঝে-মাঝে খাল চলে গেছে

বনের মধ্যে। কাঠ, গোলপাতা বোঝাই দু'চারখানি নৌকা নদীতে এসে পড়ছে। স্বামী নৌকা দেখে, 'পাস' সই করে দিচ্ছেন। ওরা কিছু-কিছু 'নজর' দিয়ে যাচ্ছে। এই বাবুদের হাতে বাওয়ালীদের অনেক সুখ-সুবিধা। নৌকাগুলি সবই 'সুপতি' ফরেস্ট আপিসের 'পাস' করা।

সুপতিই আমাদের গন্তব্য স্থান। ওখানে একজন রেভিনিউ অফিসার ছুটিতে যাবেন। তাঁর জায়গায় স্বামী থাকবেন। সুপতি বড় স্টেশন। যত মণ ইচ্ছে নৌকা ওখানে পাস হয়। এর নিকটবর্তী আর আর ফরেস্ট আপিসগুলিতে নির্দিষ্ট আছে, যেমন—তিনশো মণ কি সাতশো মণ। এমন দুর্গম ভয়-সংকুল স্থানে মানুষ সহজে আসতে চায় না। তাই বেশি লাভের প্রলোভন দেখিয়ে লোককে এখানে টেনে আনবার জন্য গভর্নমেণ্টের এই কারসাজি।

বেশ কয়েকদিন লেগেছিলো ঝড়-জলে ওখানে পৌঁছোতে। আষাঢ়ে বৃষ্টি মাঝে-মাঝে উত্ত্যক্ত করে তুলতো। আবার বৃষ্টির জলে নদীর জলের মেশামেশিতে ভালো লাগতো বর্ষার দিনে। উপরে বন, নীচে নদী, মাথার উপর বৃষ্টি—অপূর্ব সমাবেশ।

নৌকা চলছে। যাচ্ছি, যাচ্ছি। একদিন সকালবেলা দেখলাম বনের মধ্য দিয়ে একটি ছোটো ঝিরে খালের জল গড়িয়ে ভাঁটার টানে নদীর মধ্যে পড়ছে। খালটার ভিতর হাতখানেক জল। এইসব খালের মধ্যে 'বে-পাসী' নৌকা চুরি করে লুকিয়ে থাকে। সেইজন্য বোটের ডিঙি নিয়ে স্বামী গেলেন উপরে।

খালে তো জল নেই, চারজন বোটম্যান সর-সর করে টেনে নিয়ে চললো। বেশ মজা দেখতে। কিন্তু একটু যেতে-না-যেতে ওরা আবার ফিরে এলো খুব ব্যস্তভাবে। জিজ্ঞাসা করলে বললো, "হিয়েল', এখানে নিকটে কোন জায়গায় 'হিয়েল' আছে। ওরা বাঘকে বলে 'হিয়াল' আর হিয়েল অর্থে শেয়াল।

বাঘের গায়ের গন্ধ নাকি পেয়েছে। আর বাঘ যে-মাছ ধরে খাবার জন্যে,—সেই মাছ দেখতে পেয়েছে। বাঘ নাকি ভাঁটার সময় খালের মধ্য দিয়ে হাতড়ে মাছ ধরতে ধরতে যায়। একটা করে মাছ ধরে আর আছাড় দিয়ে উপরে ফেলে। মাছ ধরা শেষ হয়ে গেলে ওই মাছগুলি কুড়িয়ে খেতে-খেতে আবার ফিরে আসে নির্দিষ্ট জায়গায়। ওর একটা মাছ যদি কেউ নেয় অমনি টের পায়। তার আর রক্ষা নেই।

বাতাসে-বাতাসে সত্য যেন একটা পচা গন্ধ পেলাম। ওরা তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নৌকা ছাড়বে আর কি, অমনি হালুম-হালুম করে ডেকে উঠলো নিকটেই। মানুষের গন্ধে বাঘ মশাইয়ের প্রাণ মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি আমাদের নৌকা ছাড়া হলো। বোটের বন্দুকে স্বামী কতগুলি ফাঁকা আওয়াজ করলেন। সুন্দরবনে সব আপিসে ও বোটে বন্দুক থাকে। ঝিতো ভয়ে কেঁদেই ফেললো, কেন মরতে এই জঙ্গলে আসতে রাজি হয়েছিলাম! মেয়েটাকে হয়তো আর দেখতেই পাবো না।

আর আমার যা অবস্থা! না-মরা, না-বাঁচা। চোখ ফেটে জল এলো। এদের কথাই সত্যি। নইলে কোন্ প্রাণে মা আমাকে জলে ভাসিয়ে দিলো? হয়তো সত্যি সৎমা। অবিশ্বাস সংশয়, দুঃখে অসম্ভব বেদনাতুর হয়ে উঠলো মন।

ভোলাকে ডাইনে রেখে আমাদের বোট নামলো বলেশ্বর নদীতে।

মস্তবড়ো নদী। এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। মধুমতী নদীর গোড়ার নামই নাকি বলেশ্বর। বলেশ্বর বন্যনদী। তবে ভোলার চেয়ে কিছুটা শান্ত। জল ঘোলা, লবণাক্ত।

শুনলাম, এই বলেশ্বরের ডাইনে বঙ্গোপসাগর হরিণঘাটার কাছে আছে নীলকমল তীর্থ।

কোন যুগে কোন নৌকাযাত্রী সাগরের জলে নীলপদ্ম হাতে নীল মানুষের ছায়া দেখেছিলো। তাই তার নাম নীলকমল তীর্থ। প্রতিবছর পৌষ মাসে বড় মেলা হয় নাকি সেখানে।

নদীর পারে বনে অনেক বানর দেখতে পেলাম।

কেওড়া ফল খাচ্ছে। পাতা ভাঙছে, কিচির-মিচির করছে। আর দেখলাম, এক জায়গায় প্রচুর আমবন। পাতাগুলি ছোটো। গাছও ছোটো। এখনও খুব ছোটো থলো-থলো কিছু-কিছু আম দেখলাম। বানররা সানন্দে ডাকাডাকি, হুড়োহুড়ি করে খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে। শুনলাম, ওখানে অনেক ইটের স্তূপ আছে। কোনো নগর ছিলো এককালে। আমগাছগুলি তার সাক্ষ্য। এখন আমগাছগুলি ছোট ও বুনো হয়ে গেছে।

মুর্শিদাবাদের ঝি-টা দিব্বি খায়-দায়, ঘুমোয়। স্বামী নিজের কাজ করেন। আর আমি সব সময় নদীর দিকে চেয়ে থাকি।

অক্ষয় মাঝে-মাঝে স্নেহ শাসনের সুর মিশিয়ে ভর্ৎসনা করে। বলে, না-খেয়ে, না-নেয়ে গাঙের দিক চেয়ে থাকলিই যেন মা-বাবাকে পাওয়া যাবে নে। না-বাবা! যারা গাঙের জলে ভুধির বালক ভাসায়ে দিতি পারে, তারা আবার মা-বাবা!

রাগে গা জ্বলে যায়। কিছু বলিনে।

বলেশ্বরের বাঁক ফিরে নৌকা অকূল জলে নামলো।—শুনলাম, সাত-নদীর মোহানা।

সব বনরেখা লুপ্ত হয়ে গেছে। তরঙ্গায়িত ঢেউয়ে নেচে-নেচে এগিয়ে-পিছিয়ে চলতে লাগলো ওনা। জল উছলে ফুঁসে আসতে লাগলো গলুইয়ে। শুধু জল। অফুরন্ত, উচ্ছ্বসিত জল।

উপরে আষাঢ়ের সজল গম্ভীর আকাশ, নিচে সীমাহীন কল্লোলিত জল, মাঝখানে ভীতি-বিহ্বলা আমি।

নৌকা নোঙর করলো। স্থির হলো ওনা।

এবার হুঁশ হলো আমার। চেয়ে দেখলাম, বামে ছোট্ট নদী। ওপারে ঘন বন। আর সামনে জেটি। উপরে ধানসাগর ফরেস্ট আপিসের মতো সুন্দর কাঠের বাড়ি। খুব উঁচু, মজবুত। কাঠের বোর্ডে লেখা—সুপতি।

যে-নদীর 'পরে বোট নোঙর করলো, সে স্থির, শান্ত ছোটো গ্রাম্য নদীর মতো। নাম 'সোলা'। নির্জন বনের দিকে বয়ে চলেছে। সোলা ছোটো হলেও পূর্ণা, যৌবন-শ্রীময়ী। গভীর অরণ্যের গলায় দোলায়িত লতাহারের মতো। আর ডাইনে সাত নদীর মোহানা: ভোলা, বলেশ্বর সোলা প্রভৃতি। আর নদী চারটির নাম মনে নেই। বিস্তারিত, লবণাক্ত ঘূর্ণায়মান জলরাশি। আথার-পাথার, বনরেখার চিহ্নও নেই।

আপিসের বাবু মুসলমান। বাড়ি নদে-শান্তিপুর। বড়ো মিষ্টভাষী। বোটেই আমাদের খাওয়া-দাওয়া হলো। অবশ্য স্নানের সবজল উপরের পুকুর থেকে এনে দিয়েছিলো। খাওয়ার পর আপিসের বাবু আমাকে সঙ্গে করে উপরে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে বউমা, মা সম্বোধন করলেন। আমাকে ছোটো দেখে এখানে আনাতে চিন্তিত হলেন। দু-বোতল মধু খেতে দিলেন আমাকে। আর দিলেন অনেকগুলি বই, ভালো-ভালো গল্প ও উপন্যাস। আমি বই পড়তে ভালোবাসি, এ কথা আগেই উনি জেনেছিলেন। আমার কান্নার কথাও শুনেছিলেন। বললেন, 'তুমি সাবধান হয়ে, শান্ত হয়ে থেকো, মা, আমি শীঘ্রই চলে আসছি। তোমার জন্য অনেক বই আর গৌরাঙ্গ পুতুল আনবো। এসেই তোমাকে দেশে পাঠিয়ে দেবো।'

ইনিও স্বামীর চেয়ে অনেক বড়ো। স্বামীকে ছোটো ভাইয়ের মতো দেখতেন।



উনি সেইদিনই আপিসের বড়ো ডিঙিতে বিকেলে রওনা হলেন মোরেলগঞ্জের উদ্দেশ্যে। আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে আমি, ঝি, স্বামী উপরে গেলাম। বোটে থাকলো বোটম্যান-মাঝি পাঁচজন আর অক্ষয়। কথা হলো অক্ষয় বোটে রান্না করে ভাত দিয়ে যাবে উপরে।

আপিসটি দোতলার মতো উঁচু। নদী থেকে সিঁড়ি তক্তার পাটাতন করা পথ, হাত পঞ্চাশেক হবে; আপিসের বারান্দার সঙ্গে যোগ করা। আপিসটি বড়ো-বড়ো আস্ত শাল খুঁটির উপর তক্তার পাটাতন করা। ঘেরও তক্তার। ছাওয়া কাঠের ফ্রেমে গোলপাতা দিয়ে। তিনটি প্রকাণ্ড কামরা। নদীর দিকেরটা বড়—আপিস কামরা। আর পিছনের তু'টি বাবুর কোয়ার্টার। সঙ্গে বাথরুম আর ভাঁড়ার। চারিদিকে ঘোরানো রেলিং দেওয়া।

পিছন দিক দিয়ে বারান্দার সঙ্গে যোগ করা তক্তার পাটলাজের রাস্তা চলে গেছে আর একটি বাথরুম পর্যন্ত। সাপ-বাঘের ভয়ে এসবগুলি মজবুত ও ঘেরা। রান্নাঘরেও অমনি বারান্দা দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। তবে রান্নাঘরখানি মাটির তৈরি, আগুন লাগার ভয়ে। চাপরাসীর কোয়ার্টার, বোটম্যানদের ব্যারাক, সবই অমনি। তবে আয়তনে ছোটো।

চাপরাসীর কোয়ার্টারে নাকি কোনোদিন মেয়েছেলে আসেনি। বেচারারা চিরকাল আপিস-কামরায় আলো বন্দুক নিয়ে রেভিনিউ চৌকি দেয়। আর চৌকি দেওয়াই কেন বাবা! ডাকাতের বাবার বাবা তস্য বাবাও আসতে পারবে না কোনোদিন এখানে!

গভীর বন তিনদিকে কেটে আপিসটি বসানো। সম্মুখ দিকে তো সোলা, ডাইনে সাত-নদীর মোহানা। মধ্যে বিঘে দশেক জমিতে এই আপিসটি ও তু'টো পুকুর। একটি ছোটো মিষ্টিজলের পুকুর। হিঞ্চে, কলমী, পানিফল ভর্তি স্বচ্ছ জল। পুকুরটিতে নোনা জল

ঢুকতে পারবে না বলে পাড় সাত-আট হাত উঁচু। এপাশে-ওপাশে কাঠের সিঁড়ি ওঠা-নামা করে জল তুলতে হয়। পুকুরের টিলার মতো পাড়ের উপর দিয়ে হাত পাঁচেকও হয়তো উঁচু হবে না—সারবন্দী নারকোল গাছে ভরা। এমন সতেজ-সবুজ ফল-ভারাক্রান্ত শিশু বৃক্ষশ্রেণী আমি আগে কখনো দেখিনি। সমস্ত উঠোনটাও নারকোল গাছে ভরা। এত নারকোল ফলেছে গাছে যেন ধরছে না। দু'একটা খেজুরগাছও আছে। আর আছে দু'ঝাড় কলাগাছ আর একটা গোল পুকুর। উঠোনের মধ্যে নদীর সঙ্গে নালা কেটে যোগ করা। জোয়ারের জলে ভরে যায়। ভাঁটায় অল্প জল থাকে। জল লোনা ও ঘোলা। প্রতিদিনকার মাছ যোগায় এই পুকুরটি। ভাঁটার সময় ছোটো গোগা জালে মাছগুলি ছেঁকে নেয় বোটম্যানরা। প্রচুর মাছ—ভেটকি, ভাঙান, পারসে, রেখা, বুচো, দাঁতনে। বেশি পাওয়া যায় কান-মাগুর। বাগ্‌দা, ছটকাচিংড়িও মেলে; প্রচুর ট্যাংরা মাছ, আষাঢ়েও ডিম ভর্তি।

তরি নেই, তরকারি নেই, শুধু মাছের শ্রাদ্ধ। খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেলো। ডালও ফুরিয়েছে। সাতদিন অন্তর খুলনা থেকে ডাক-স্টীমারে বাজার দিয়ে যায়। আমরা যাওয়ার পরে বাজার আসেনি। আমাদেরও যা ছিলো সব ফুরিয়েছে। অক্ষয় বোট থেকে রান্না করে আমাদের দিয়ে যায়। মাঝে-মাঝে উপরে এসে দেখাশুনা করে আর আমাকে সাবধান করে, যাতে আমি উঠোনে না নামি। কিছুদিন আগে একজন বোটম্যানকে পুকুর থেকে বাঘে নিয়েছে। ব্যারাক ভেঙেও নিয়ে গেছে একজনকে একবছর আগে। ঝি শুনে কেঁদে-কেটে মরে।

সন্ধ্যা হ'লে কোনো লোকই বাইরে যায় না। লোক বা কই। মাত্র আমি, স্বামী, ঝি, আপিসের বোটম্যান চাপরাসী দিয়ে ছয় জন আর বাবুর একজন সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো বাবুর্চি।

ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিলো। গল্পও চলতো বেশ। লোকটি বড়ো ভালোমানুষ। মাটির রান্নাঘরে রান্না করে খেতো, থাকতো বোটম্যানদের ব্যারাকে। আমরা উপরে দশজন, আর 'ওনা' বোটের ছয়জন বোটম্যান, অক্ষয়,—মোট এই ষোলজন মানুষ আমরা সুপতি ফরেস্ট আপিসের বাসিন্দা। আর দু'চারখানা বাওয়ালী নৌকা পাস করে যায় কাঠ কাটতে। দু'একখানা কাঠ কেটে পাস সই করতে আসে আপিসে। কোনো সময় বাওয়ালী-নৌকা মোটেই থাকে না।

সন্ধ্যার পর তিনদিকের গভীর অরণ্য-প্রাচীর ডিঙিয়ে অধিবাসীরা আসে হাজারে-হাজারে। এই দশ বিঘে জমিতে জলোঘাস খেতে। এখানে প্রচুর ঘাস জন্মায়। গভীর বনে ঘাস থাকে না। ঘাস খায় আর পুরুষ হরিণগুলি ডাকে গম্ভীর সুরে—টেউ—টেউ—টেউ। মেয়ে-হরিণ ডাকে চিকন মিষ্টি সুরে—টিউ, টিউ, টিউ। আমরা তো আর বাইরে যাইনে, জানালা দিয়ে দেখতে গেলে ভোজবাজির মতো উধাও হয়।

এই তো গেলো রাতের কথা। দিনের বেলা সাতনদী থেকে মাছ, সাপ, জীবজন্তু-সমেত তিন-চার হাত জোয়ারের জল সব বাড়িখানি ধুয়ে নিয়ে যায়। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় সাত-আট হাত জলও ওঠে। কোনো মহারাজা কুমির বাদশা যে আসেন না তাও নয়। তবে দৈনিক নানারকম সাপ-মাছ-বাবুদের চাক্ষুষ দেখতে পাই। জোয়ার চলে গেলে থাকে ছোট্ট-ছোট্ট কাঁকড়া। ওরা তখন শালের খুঁটি বেয়ে আমাদের উপরে উঠতে চায়। আর থাকে ম্যানা মাছ। তিড়িং-তিড়িং করে কাদার পরে লাফায়।

রোজ দুপুরবেলা স্বামীর ঘুমের অবসরে মিষ্টি জলের পুকুর থেকে পানিফল তুলে খুব খাই। একদিন বাবুর্চিটা হাঁ-হাঁ করে

পড়লো। 'আঁ-ক্' করে নাকি বাঘ পড়বে। ওখান থেকে কত লোক নিয়ে গেছে খোঁড়া বাঘটা কাঁধে তুলে।

বাবুর্চিটাকে আমার খুব ভালো লাগতো। আমার বাবার মতো ওর দাড়ি। আমার বাবার মতো গল্পও করে বেশ। কিন্তু দোষ ওই—আমাকে নিচে নামতে দেবে না। অক্ষয়কে বলে দেবে আর অক্ষয় বকবে। বলবে,—তুমি বড়ো খ'রো চঞ্চল মেয়ে, বাপু। একটু থির শান্ত নেই।

রাগ যা হ'তো আমার! ইচ্ছে করতো ওর টেকো মাথাটা ঠুকে দিই।

বাবুর্চিটা অক্ষয়ের চাইতে অনেক ভালো। ওর মতো অত বকেও না, আবার অমনি না-চাইতে কতো খেতে দেয়।

'বাবুর্চি' বাবুর ভাড়ার থেকে বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, চিনি খেতে দেয়, আর ওর মেয়ে পরীবানুর গল্প করে। ও বেশ পরীর মতো সুন্দর ব'লে মেয়ের নাম রেখেছে পরীবানু। রংটা নাকি আমার মতো। চুলটা ঠিক দুর্গাপ্রতিমার মতো। একটা কাঠের কৌটার মধ্যে পরীবানুর নিবিড় কালো কোঁকড়া চুলের একটি গোছা আমাকে দেখিয়েছিলো বাবুর্চি। তার সঙ্গে ছিলো খুব লাল একটা শুকনো ফুল। ওই ফুলটা পরীবানু পরতে ভালো-বাসতো। আমিও একটি লাল ফিতে দিয়েছিলাম পরীবানুর চুলের ফুল করতে।

আমি দেখেছি বুড়ো মানুষগুলি সব থেকে বেশি দুষ্টু। বাড়িতে বাবা, আর এখানে অক্ষয়, বাবুর্চি। পথের বুড়োগুলোও অমনি। আসবার সময় শরণখোলা আপিসের নিচে স্বামী যখন উপরে গিয়েছিলেন সেই অবসরে আমি বোট থেকে নেমে খোলা-ডিঙি চ'ড়ে বোট বেয়ে সবে একটু নৌকা চালাচ্ছি, আর অমনি কোথাকার একটা বুড়ো বাঁকা-মুখো জেলে, জেলে ডিঙি চ'ড়ে যাচ্ছিলো সে—

হাঁ-হাঁ করে উঠলো। বললো, 'তুমি কেমন ধারা মেয়ে বাপু! ল্যাজের বাড়ি দিয়ে যে কুমিরে নেবে। ওঠো, শীগ্‌গীর ওঠো।' আমাকে তাড়িয়ে উঠিয়ে দিয়ে গেলো। রাগ যা হলো!

জল কেটে-কেটে ছোট্ট ডাক-স্টীমার সপ্তাহের বাজার দিয়ে যায়। টাকা আর ঝাঁকা, থলি, টিন নিয়ে যায়। যেখানে জনমানব নেই—'সেলিংকুপে' 'কিউয়েলকুপে' 'মার্কিংকুপে' ডাক, বাজার দিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা—এই হলো স্টীমারটির কাজ।

খুলনার বাজারের সব্‌জি দু-তিন দিন মাত্র থাকে। তারপর সুদ্ধু মাছ। মাঝে-মাঝে কৌটোর দুধ আনাতেন স্বামী। আর আনাতেন ফজলী আম। তা থেকে আমিও দু'একটি খাই।

প্রায় সময় বোটে নেমে যেয়ে অক্ষয়ের 'পরে দৌরাত্ম করা আমার একটি বিশেষ কাজ!—'দাও আমাকে বড়া ভেজে!'

'কি দিয়ে বড়া করবো, ডাল তো ফুরিয়েছে।'

'চাল বেটেই করো।'

'সিদ্ধ চালের শুধু পিটুলির বুঝি বড়া হয়?'

আমি নাছোড়বান্দা। পিটুলির বড়া হলো শক্ত চ্যাড়ার মতো। দাঁতে ভাঙতে পারলাম না। ভাত খেলাম না। ও বিরক্ত হয়ে বললো, 'তুমি বায়নাধারী মেয়ে বটে!'

আমি ভাত খেলাম না, শুধু বললাম, 'মা নেই, মা নেই বলে মায়া দেখাও বাপু, আমার মা হলে বড়া করে দিতোই।' ও কোথায় সোঁলার ওপার থেকে হেতালের মাথী কেটে বড়া করে দিলো। বললো, 'মা, তুমি আমার গোরীর মতো। তাই দু'এক কথা বলি, কিছু মনে করো না। আমার গোরী তোমার বয়সী। তোমার মতোই দেখতে। ওকেই বা আর কয়দিন রাখবো!' ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

মনে পড়ে আমার বাবার কথা। কান্না আসে। আমার বাবাও তো এমনি আমার জন্য ভাবে। কাঁদি। ও কত সান্ত্বনা দেয়।

জিয়াগঞ্জের ঝি খায়-দায়, ঘুমোয়। আমার কাছ থেকে তার একমাত্র মেয়ে শৈলর জন্য সাবান, তেল, আলতা যোগাড় করে। আর আমার চুলগুলি হাতড়েই ছিঁড়ে নিয়ে মেয়ের জন্য ছুট তৈরি করে। ওর কথা ভাবলে রাগ হয়। বড় স্বার্থপর লোক। আমার সব খাবারগুলো খেয়ে নিতো।

আমার দিন রাত কাজ বই পড়া আর মুসলমান বাবু যে দু-বোতল মধু দিয়েছিলেন তাই একটু-একটু করে খাওয়া।

আষাঢ়ের বেলা। সময় কাটে না। ঝিটা দুপুরে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে-বসে ঘুমোয়, আর ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ফিক ফিক করে হাসে আর বিড়-বিড় করে কি কথা বলে। ভয়ে কান্না আসে। ভাবি নিশ্চই গল্পের ডাইনী।

বাড়ি থেকে বাবা-মা আমায় কতো আদর করে পত্র দিলেন। আর একখানি সুন্দর পত্র লিখলেন পুঁটি পিসী। মায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর একখানা চিঠি এলো ভানুদিদির কাছ থেকে। ভানু-দিদি আমায় বড় ভালোবেসেছিলো।

আষাঢ় চলে গেলো। শ্রাবণের অঝোর বৃষ্টি নামলো, নারকোল পাতায়, বনের লতায় গাঢ় সবুজের রং ধরলো। পল্লবাকীর্ণ বনানী আমায় হাতছানি দিলো। বনের সবুজে, মনের সবুজে হলো মিতালী। ভালোবাসলাম বর্ষাস্নিগ্ধ বনভূমিকে।

সাত-নদীর জল উতরোল হয়ে ভেঙে পড়লো সৌলার বুকে। সৌলার বুকচেরা একটা শিসেখাল চলে গেছে আপিসের পিছন দিয়ে। তাতে বনহাঁস, পানকৌড়ি ভাসলো। ডাহুকী মা স-সন্তান খেলা করলো নল-বাগলো লতা-ঝোপে। এই নল-বাগলোফল বনের

একটি খাবার জিনিস। নল-বাগলো, গোলফল, কেওড়া হেতাল-মাথা—বনের এই জিনিসগুলি খাওয়া যায়।

অলস দুপুরে ঘুঘু, বনমুরগী ডাকে। বনমুরগী এখানে প্রচুর। ডাকমুরগীর মতোই। দেখতে ঘোরালো কালো, ধূসর, পাটকেলী। এদের পালক খুব বেশি। বন্যশ্রীতে সতেজ সুন্দর। সকালবেলা গাঢ় সবুজ-রঙা বন-টিয়ের ঝাঁক ওড়ে মালার মতো হয়ে সৌলার এপার থেকে ওপারে।

কতো রকম পাখি, সাপ, বানর, হরিণ, বাঘ, মাছ, কুমির—ওদেরই তো দেশ।

অসংখ্যের বিস্তারের কাছে ষোলজন মানুষের অস্তিত্ব কতটুকু? বজ্র-মধুরে, কল-কাকলীতে মুখর বন-প্রদেশ। মানুষের সাড়া নেই। ফড়িং আর কতরকম পোকা আছে ঘাসের ডগায়। গাঙ্-শালিক, পেঁচাও বেড়ায়। আকাশ, বাতাস, নদীর কল্লোলে বর্ষা-গম্ভীর অরণ্যানী যুগ-সংগীত রচনা করে। জন-মানবহীন বর্ষার নিস্তব্ধ বনশ্রী মানুষকে ভোলায়, দোলায় পূর্ণ করে দেয়।

ওখানে সব বাসিন্দাদের সঙ্গে কিছু-কিছু পরিচয় হলো—হলো না শুধু রাজামশায় হালুমের সাথে। বর্ষার সাথে যেদিন দমকা বাতাস থাকে, সাত-নদীর জল উত্তাল হয়ে আছড়ে-আছড়ে ছুটে আসতে চায় সৌলার বুকে। সৌলাও ফুঁসে প্রতিরোধ-ঝাপটা মারে। পারে না। উত্তাল তরঙ্গ-বিধ্বস্ত করে যায় ওর স্থির, সুন্দর গতিকে।

সেই ভয়াল তরঙ্গের সঙ্গে ওঠা-নামা করে দৈত্যের মাথার মতো কি একটি কালো। ঝি, আমি ভয়ে মরি। ভাবি বাঘ, নয়তো কুমির। কতোক্ষণ চেয়ে-চেয়ে দেখি। কিছুক্ষণ পরে আর দেখতে পাই না। কোথায় জানি ডুবে যায়।

ওটা কি, এখনো জানি না। সাত-নদীর গোলাকার উচ্ছ্বসিত-

জলরাশির মধ্যে কালো, ভয়ঙ্কর বস্তুটি আমার কাছে রহস্যময় হয়ে আছে।

অক্ষয় একটা জিনিস রান্না করে খাওয়াতো। খুব ভালো লাগতো কুচো চিংড়ি দিয়ে কেওড়া ফলের টক। চমৎকার হতো। ওখানে পুকুরের জল মিষ্টি হলেও দুধ নোনা। শুধু রান্না আর চান করা চলতো। খেতাম বৃষ্টির জল। আপিসের উঠোনে জায়গায়-জায়গায় মাচা তৈরি করা আছে, বৃষ্টির সময়ে ছোটো-ছোটো হাঁড়ার মুখে ন্যাকড়া দিয়ে ঢেকে পেতে রাখে, বৃষ্টির জল বাঁধে—তাই কর্পূর দিয়ে খেতে হয়।

দুপুরবেলা আপিসের বারান্দায় বসে বনের দিকে চেয়ে-চেয়ে যেন মনে হয়—ওই যে গাছ, ওর পারেই যেন আমাদের বাড়ি। মা যেন আমাদের লাল টুকটুকে সুমিত্রে গোরুকে দুধ দুইয়ে নিচ্ছেন এমনি সময়ে। আর ওই যে হোথায় বড় গাছটার মাথা—ওটা যেন পুঁটিপিসিদের টুরে আমগাছটা। ওর তলায় তো ওদের বাড়ি—কত সুন্দর-সুন্দর ফুলের গাছ: বেল, জুঁই, টগর, মাধবীলতা। কী চমৎকার গন্ধ গন্ধরাজ ফুলগুলির। কতো পাতাবাহারী গাছ আর সারা বাড়ি আম-কাঁঠাল, জামরুল-লিচুতে ঘেরা। কেমন নিকোনো, লেপা-পোঁছা পুঁটি পিসিমার হাতের ঘরগুলি। এমনি সময় দাওয়ায় বসে পুঁটি পিসিমা কার্পেটের উপর টিয়েপাখি তুলছেন নিশ্চয়।

ঝি ডাকে, চুল বাঁধবে না ছোটো সই? মন ফিরে আসে আবার নিঝুম বনে।

একদিন একটা মায়া-হরিণ মেরে আনলো ডিঙি করে দূর বন থেকে। হরিণের চোখের কথা পড়েছি। দেখতে গেলাম। দেখলাম, বন-বধূর অর্ধ-নিমীলিত আঁখি দুটি কোন দূর-বনমায়াচ্ছন্ন। তখনও রক্ত ঝরে পড়ছে বুক থেকে। বন-রানীর সুচিত্র তনুলতায়

অন্তিম মুহূর্তের রক্তের সমাবেশ। দেখতে পারলাম না, চোখ জলে ভরে এলো।

কেমন একটা শব্দ শুনতাম। অনেক সময়, অনেক সময় দূর থেকে ভেসে আসতো—হুর-হুর-হুর। বড্ড ভয় করতো নতুন-নতুন। শেষে সয়ে গিয়েছিলো। শুনলাম বঙ্গোপসাগরের জলের শব্দ। আরও শুনলাম ওই সমুদ্রের ধারে আছে অনেক মাইল বিস্তারিত উলুক্ষেত। সেখানে শুধু বাঘ, হরিণ চরে। নাম 'সাপলার চর'। কতো শিকারী যায় সেখানে হরিণ-বাঘ শিকার করতে।

যেদিন বর্ষা নামে—নদীর জল, দূরের বন, বনরেখা শুধু ধোঁয়ার মতো দেখায়। বর্ষায়-বর্ষায় মন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

স্বামী মাঝে-মাঝে পেট্রোল করতে যান সেই শরণখোলার আপিসে; আর জানি কোন পর্যন্ত। আসতে অনেকদিন লাগে। সেই সুযোগে আমি দুপুরবেলা আপিসে গিয়ে বসি আর কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করি। দোয়াতের লাল কালি দিয়ে পুতুলের কাপড় ছোপাই। অক্ষয় বারণ করে। কে শোনে তার কথা? নৌকা থেকে বাওয়ালীদের ডেকে আনি। তারা আসতে চায় না: মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে। তবুও আসে। আমি তো যেই-তেই বস্তু নই, বনকর বাবুর বউ।

ভয়ে-ভয়ে আসে। তারা তো জীবনে এমনটি আর দেখেনি। অবাক্ হয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখে।

আমি 'বলি, বসো, বসো। তোমরা গল্প জানো? বলতো একটা।

ওদের মধ্যে যে বুড়ো, সে একটি বাঘের গল্প করে হয়তো: তার যখন বয়েস ছিলো চারটে-পাঁচটা বাঘ সে মেরেছিলো দাবড়ে, লাঠি করে। অবাক্ হয়ে শুনি।

আবার হয়তো জিজ্ঞাসা করি, 'তোমরা কে-কে তাস খেলতে পারো?'

দু'একজন বলে, পারি। তোমাদের তাস আছে ?

ওরা বলে, না, মা; আমাদের তাস নেই। আমার নিজের মাত্র একজোড়া তাস ; ওদের লোক-সংখ্যা হিসেব করে দেখা গেলো তেরো। বিমর্ষ মুখে বলি, আমার একজোড়া তাসে তো তোমাদের সবার হবে না, তা আর কি হবে ? নইলে দিতাম।

স্বামী যখন থাকতেন না, বেশ গল্প-গুজরণে দিন চলতো ওদের সঙ্গে। বোটে, আপিসে, বাওয়ালীদের নৌকায় অবারিত গতি ছিলো আমার। অক্ষয়ের বাটনা বেটে, কুটনো কুটে, চাল-ডাল, ছড়িয়ে ওর বকর-বকর শুনতে খুব ভালো লাগতো। শেষে এও পর্যন্ত ও মন্তব্য করেছিলো, আমার ওই স্বভাবের জন্যই আমার মা-বাবা আমায় দেখতে পারেন না। তা এখানে পাঠাবে ছাড়া কি করবে ? বড়ো বাঁচা বেঁচে গেছে তারা।

তার মানে আমি ওর ঘাড়ে চেপেছি সেটা উহ্য থাকতো। আমিও রাগ করে বলতাম, 'আমার মা-বাবা বেঁচে গেছে, তুমি তো মরো।'

ঝিটা আমায় কাপড়, জামা, গয়না পরতে বারণ করে। কাপড়-গয়না পরলে স্বামী নাকি ভুলে যেয়ে আমাকে পাঠাবেন না। রাগ যা হয় ওর পরে। বাড়ি যাওয়ার জন্য ও পাগল হয়ে উঠেছে।

কয়েকদিন রৌদ্রের পরে বৃষ্টি নামছে নতুন করে। সৌলার ওপারে কালো মেঘের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সাদা-সাদা লঘু খণ্ড-খণ্ড মেঘ উড়ে যাচ্ছে বনের মাথার উপর দিয়ে। খণ্ড মেঘগুলি মেঘলা বাতাসে যখন ভেসে-ভেসে যায়, মনে পড়ে বাবার কথা।

বাবা বলেছিলেন, সমুদ্রের ধারে ওরা শালের পাতা খেতে যায়। তাই বুঝি ওরা এসেছে ? কিন্তু এখনও চলে যাচ্ছে যে। ওরা ঠিক আমাদের বাড়ি দিয়ে এসেছে। আমার বাবাকে দেখেছে নিশ্চয়। ওরা সুঁদুরের পাতা খেতেও তো পারে।

ডাকি,—এসো-এসো, শোনো-শোনো।

বাবার খবর জানতে মন চায়। ওরা আমার কথা শোনেও না। দল বেঁধে শুধু চলেছে।

নদীর পারে, সবুজ বনের মাথায় কাজলমেঘের কোলে ঝিলিক দিচ্ছে। বাবা বলেছিলেন—বিদ্যুৎ বউ-রা—যখন রান্না করতে করতে বড্ড গরম লাগে, রান্নাঘরের পিছনে এসে তখন গায়ের কাপড় খোলে। ওদের গায়ের রং অমনি আলোর মতো।

লজ্জা করে না বুঝি তাদের, বউমানুষ গায়ের কাপড় খুলতে ? তা যাই হোক রংটা কিন্তু ওদের বেশ। আমার রংটা যদি অমনি হতো! আমাকে সবাই ডাকলে আমি যেতাম কিন্তু। ঝিলিক বউয়ের বড্ড দেমাক। আমি কতো ডাকি, আসেও না।

গোলপুকুরটার কালো ব্যাঙ্‌টা হেঁড়েগলায় মাঝে-মাঝে ডেকে ওঠে। তারপর তো বৃষ্টি পড়লে ওরা সবাই মিলে ডাকবে। সোনা ব্যাঙ্‌টা বলবে, 'গোরু কিনতে যাবি ?'

রুপো ব্যাঙ্‌টা উত্তর দেবে, 'যাবো।'

হলুদ-রেখা ব্যাঙ্‌টা বলবে, 'কে, কে ?'

পাতাসি ব্যাঙ্‌টা বলবে, 'আমি ; এ-ও সে—। আমি এ-ও সে।'

সবুজ ছড়া-কাটা ব্যাঙ্‌টাও বলবে, 'যাবো ও—ও—ও—। যাবো, ও—ও—ও— ; আমি, এ-ও-সে।'

কী—মজা লাগে শুনতে।

একটা লোককে পুকুর থেকে বাঘে নিয়েছিলো। তাই খুলনা থেকে ডাক-স্টীমারে বাঘ মারবার জন্য খোঁয়াড় আর একটি ছাগল পাঠিয়েছে। একজন শিকারীকেও আনা হয়েছে মোরেলগঞ্জ থেকে। সে আপিসে খায় দায়, থাকে। খোঁয়াড়টা পেতেছে বলেশ্বরের

পাড়ে, গভীর জঙ্গলে। ছাগলটাকে রোজ আপিস থেকে ঘাস জল দিয়ে আসে বোটম্যানরা ডিঙিতে করে।

আমার কিন্তু ছাগলটার জন্য কান্না আসে। মন কেমন করে। আহা! ওর ভয় করে না বুঝি?

ঝি-র কাছে থকেতেও ভালো লাগে না। অক্ষয়টাও বড় বকে।

রোজ জোয়ারে যখন জল ওঠে উঠোনে, আমি একটা শিঙ্ড়ে ডাল নিয়ে ঘোলাঘুলি করি সাপ-মাছদের সঙ্গে। মাছ ধরতে ইচ্ছা করে। ধরতে পারি না। শেষ পর্যন্ত দু'চারটে কর্কট-শিশুই যা ধরা পড়ে। ওদের লুকিয়ে রাখি মুসলমান বাবুর ভাঁড়ারের নতুন হাঁড়িতে। কাঠি দিয়ে দিয়ে ওদের সাথে খেলা করি। ওরা তিড়বিড় করে। বেশ ভালো লাগে দেখতে। আজকের সাথী-গুলিকে কাল জোয়ারে ছেড়ে দিই। কাল আবার নতুন সাথীদের ধরে আনি। ভাবি, ওরা না খেয়ে মরবে, তাই।

বনে বৃষ্টি নামলো। ভরা-শ্রাবণের অঝোর-ঝরন বৃষ্টি। শুধু বৃষ্টি। ঘর থেকে বেরুতে পারিনে। কাপড়-জামা শুকোয় না। নদীর জলে, জোয়ারের জলে, বৃষ্টির জলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বনের গাছগুলিও যেন ভেজা বেড়ালটি।

আজকাল কিছু ভাল লাগে না। বর্ষার নদীর জলের সাথে কতো চোখের জল যে মেশে। মাঝে-মাঝে গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়। জনহীন, নির্জনতায় ভয় করে।

এমনি একটা বর্ষণ-ক্লান্ত রাত্রে বাঘের গর্জনে ঘুম ভেঙে গেলো। মনে হতে লাগলো আপিসের মানুষগুলিকে পিষে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে খেয়ে নিচ্ছে। ভয়ে,আতঙ্কে আমার যা অবস্থা। শিকারী আপিসের মধ্যে দাঁড়িয়ে ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগলো। গর্জন যখন বেড়ে চলতে লাগলো তখন সবাই বুঝলো খোঁয়াড়ে বাঘ আটকে গেছে; তারই বিফল গর্জন। খোঁয়াড় পাতা হয়েছিলো এক মাইল

দেড়মাইল তফাতে। মনে হতে লাগলো কতো নিকটে। সমস্ত রাত সাতনদী, নিস্তব্ধ বনভূমি কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো ভয়ার্ত গর্জনে।

আতঙ্কিত রাত্রিটি কাটলো। বাঘ-রাজ যেন ক্রমে ঝিমিয়ে পড়তে লাগলো। কণ্ঠস্বর কেমন ভাঙা-ভাঙা। আপিসের দু-খানা ডিঙি, প্রায় লোকগুলি আপিসের বন্দুক, শিকারীর বন্দুক নিয়ে রওনা হলো। ভোরবেলা তিন-চারটে গুলির শব্দের সঙ্গে মরণাহতের শেষ চিৎকার প্রতিধ্বনি হয়ে বাজলো সৌলার ওপারে। আর বেজেছিলো আমার ছোট্ট বুকটায়।

ওরা ফিরে এলো। জলোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে ডিঙি ভিড়ালো। কী ব্যাকুল প্রতীক্ষায় যে সময় কাটছিলো। জেটির ওপর রাখলো মৃত বাঘটাকে। ভয়ে ভয়ে দেখতে গেলাম। আর দুর্গন্ধে নিকটে যাওয়াও যায় না। দেখলাম, এতটুকু মৃত্যুমলিন করতে পারে নি প্রকৃতি-মায়ের মুক্ত সন্তানকে। সজীব, পুষ্ট, মসৃণ, ডোরাকাটা বনরাজ যেন কপট ঘুম ভেঙে এখুনি উঠবে। মরে গেছে, বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। ওরা নখগুলিকে কেটে নিলো, হার, ঘড়ির চেনে লকেট করবে বলে। ওরা বাঘের চামড়াও ছাড়িয়ে নিলো।

সাহেব এসে চামড়া নিয়ে যাবে আর শিকারীকে দু-শো টাকা দিয়ে যাবে। বড়ো বাঘ মারলে দুশো, ছোটো মারলে পঞ্চাশ টাকা। সুন্দর বনের বাঘ সবাই যে কোনো মুহূর্তে মারতে পারে, কিন্তু বনের একটা পাতাও ছেঁড়ার আইন নেই।

প্রায় দু-মাস হয়ে গেলো। সুপতির স্বামীকে চিঠি দিলেন আরও তিনমাসের ছুটি নিয়েছেন অসুস্থতার জন্য। তার মানে তিনি এখানে আর ফিরতে চান না,—বাঘের মুখে, জলের অতলে।

এদিকে স্বামীকে বদলী করলো ফিউয়েল কুপে। কাজেই আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো।

ফিউয়েল কুপ। সেখানে জ্বালানী কাঠ বিক্রি হয়। নিবিড় জঙ্গলের ধারে, নদীর মধ্যে কতোগুলি ফ্লাট। বোট, ডিঙি রেঞ্জার, ফরেস্টার, মার্কার, চাপরাসী বোটম্যানরা থাকে। যেন ওদের একটি পাড়া। সেখানে অনেক,—যত ইচ্ছা মণ হিসাবে জ্বালানী কাঠের নৌকা পাস হয়। মার্কিং কুপ, সেলিংকুপও এমনি। তবে কাঠ বিভিন্ন। ডাক-স্টীমারে খুলনা থেকে ডাক-বাজার দিয়ে যায়। মিষ্টি জল বোটম্যানরা ডিঙি করে জালা ভরে নিকটবর্তী স্থান থেকে নিয়ে আসে। দু-তিন বছর কুপগুলি হয়তো এক জায়গায় থাকে, জঙ্গলের কাঠ কম হয়ে গেলে অন্য জায়গায় চলে যায়।

ঝি তার মেয়ের জন্য বড়ো ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

আমিও সেদিন ব্যস্ত হয়েছিলাম বৈ কি। খুব ব্যস্ত হয়েছিলাম মায়ের কোলে ফিরবার জন্য।

কথা হলো আমাকে ও ঝিকে বাগেরহাট রেখে স্বামী ফিউয়েল কুপে যাবেন। ওখান থেকে বাবা আমায় নিয়ে যাবেন।

একদিন বর্ষাপুষ্ট বন-ভূমির কাছে বিদায় নিলাম।

পথে আসতে বলেশ্বর ছাড়িয়ে ভোলায় পড়াবার বাঁকে কতকগুলি শশুক হুস-হুস করে জল ছড়াচ্ছিলো। আশ্চর্য লাগে মানুষের মতো দেখতে এই নিরীহ জল-জন্তুকে। বাঁকের মুখে দূরে একখানা বোট দেখা গেলো। শুনলাম, একজন বাবুর বোট। বাবুর সঙ্গে স্বামীর আগেই পরিচয় ছিলো। ডাকাডাকি করে দুখানা বোট এক জায়গায় করা হলো।

বাবুর স্ত্রী আমাদের বোটে এলেন। আমিও গেলাম। তিনি আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো। তাঁর তিন বছরের একটি মাত্র ছেলে মারা যাওয়ায় স্বামীর কাছে এসেছেন সান্ত্বনার জন্য।

বউটির মাথার একটু গোলমাল ছিলো। ওদের গ্রামোফোনে

অনেক গান শুনলাম। খুব ভালো লেগেছিলো সেদিন সান্ধ্য বাতাসে জলের ভাষাতে মেশা গানগুলি।

ফেরবার পথে সুন্দরবনে আর একটি জিনিস দেখলাম। সেদিন নদীতে ভরা জোয়ার এসেছে। একটি বড় খাল চলে গেছে ধানশীবনের মধ্য দিয়ে বনের ভিতর। জোয়ারী বাতাসে ধানশী সির্‌সির্‌ দুলছে। ঘাসভর্তি বিচিত্র বর্ণের বহু হাঁস জলে ভাসছে। আশ্চর্য লাগলো। এখানে এতো হাঁস কি করে এলো ?

সে ভ্রম একমুহূর্তেই শেষ হলো ; আমাদের নৌকা নিকটে যেতে দাঁড়ের শব্দে প্যাঁক্‌-প্যাঁক্‌ করে সব হাঁস উড়ে গেলো। শুনলাম, ওরা বুনো হাঁস। সুন্দরবনের জঙ্গলে বাওড়ের গাছে বাসা বেঁধে থাকে।

মোরেলগঞ্জ এসে আবার টেলিগ্রাফের তারের সাথী হলাম।

একটি বৃষ্টি ম্লান সন্ধ্যায় বোট নোঙর করলো বাগেরহাট, কমল-কুমারী ঘাটে। অক্ষয় স্নেহ-করুণ মুখখানি তুলে আমায় শত সাবধান করে বিদায় নিলো। ও স্বামীর সঙ্গে ফিউয়েল কুপে যাচ্ছে। আমায় বলে গেলো, আমি যেন শীগগির দেশে চলে যাই।

আর অক্ষয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি কোনদিনও।

কালের কষ্টিপাথরে কত স্নেহ ভালোবাসা যাচাই হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এমন তিরিক্ষি মানুষগুলির পিতৃ-স্নেহামৃত হয়তো তেমন করে কোনোদিন মুছে যাবার নয়।

বাগেরহাটে বাবা এলেন আমাকে নিয়ে যেতে। পুজো এসে পড়েছে। সবাই আমাদের অপেক্ষায় আছে। আবার পানসী নৌকায় রওনা হলাম জন্মভূমির উদ্দেশ্যে।

কাচিপাতা ছাড়িয়ে, জলমার হাট ভেঙে, চুকনগর ডুমুরিয়ার হাট দিয়ে, ভেরচির পাটের ক্ষেতের পাশ দিয়ে কাটাখালির খাল পেরিয়ে নৌকা নামলো কেষ্টনগরের বিলের মধ্যে।

ধানবন, কলমীলতা, লাল ফুল ঠেলে নৌকা ভিড়লো মানিকতলার খেজুরবনের পাশে।

ওখান থেকে আমাদের বাড়ি খুব নিকটে। মুসলমান পাড়া দিয়ে আমাদের বাড়ির পিছনের পথ ধরে বাঁজি, ক্ষীরে-র আমতলা দিয়ে ঘুরে এসে দাঁড়ালাম আমাদের উঠোনে।

আমাদের দেখতে পেয়ে সবাই ছুটে এল। মা এলেন রান্নাঘর থেকে রান্না ফেলে। আমায় কোলে তুলে নিলেন। আমি মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে সঞ্চিত বেদনার, অভিমানেব কান্নায় ভেঙে পড়লাম। সে কী কান্না! সাত-নদীর জল, বনের দীর্ঘশ্বাস এনেছিলাম বুকে পুরে, সব ঝরিয়ে দিলাম মায়ের বুকে। আমি যতো কাঁদি মাও তত কাঁদেন। উচ্ছ্বসিত সাত-নদীর জল ফুরিয়ে গেছে। অভিমানের ফোঁপানিতে আমার ছোট্ট মাথাটা শুধু মায়ের বুকে কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

জ্যাঠাইমার রোয়াকে বসে অন্ধ পূর্ণ বৈরাগী তখন গান গাইছে :

শারদ সপ্তমী উষা গগনে প্রকাশিল
দশ দিক আলো করি দশভুজা মা আসিল।
কখন আসিবে মেয়ে
ছিলাম তার পথ চেয়ে······

পুরনো বাড়ির সপ্তমী পুজোর বাজনা বেজে উঠলো। তারপর চৌধুরীবাড়ির, তারপর পূবের বাড়ির, তারপর রামলাল ভট্টাচার্যের বাড়ি, তারপর রামগোপাল ঠাকুরের বাড়ি হয়ে নহবতের সানাইয়ের সুর গ্রামের প্রান্তের গোলপুকুর হয়ে, কৃষ্ণচূড়া তলা দিয়ে পাঁজিয়ার বিল ছাড়িয়ে মিশলো যেয়ে চূয়াডাঙায় কৈলাস সা'র বাড়ির নহবতের সুরে। সেখান থেকে .হদ, মাগুরখালি, নারায়ণপুর, কৃষ্ণ-নগর। আর? আর? তারপর, তারপর অনেক দেশ; তারপরে দূর—দূর—দূর, শুধু দূর, বহু দূরে।

জন্মগ্রহণ করেছিলাম একটি প্রাচুর্য-সুন্দর দিনে। ভাত, মাছ, ঘি, দুধ হেলায়-ফেলায় খেয়ে মানুষের দিন চলতো সে-দিনটিতে। সে-দিনের ক্ষীর, ননী আজ তো শুধু স্মৃতির খোরাক। তবুও সেই দিনটি ফিরিয়ে আনতে মন চায়। জানি লাভ নেই। তবু বৈশাখের উত্তপ্ত দিনে শ্রাবণের জলময় স্মৃতি মানুষকে সঞ্জীবিত করে তোলে।

সেই এগারো বছর বয়সে গিয়েছিলাম সুন্দরবনে, আজ আবার চৌদ্দ বছরে যাচ্ছি। স্বামী এখনও চাকুরী করেন। আগে ফরেস্টার ছিলেন, থাকতেন বোটে। এখন রেভিনিউ-অফিসার, আপিসেই থাকেন।

আমি ভয়ে এতোদিন যাইনি। সুপতি ফরেস্ট-আপিসের কথা মনে হ'লে এখনো বড় ভয় করে। আমাকে নেবার জন্য নৌকা এসেছিল দু'বার। দাদাশ্বশুরের হাত-পায়ে ধরে দু'-দুবার নৌকা ফিরিয়েছি কেঁদে-কেঁদে। এবার আর উপায় নেই, যেতেই হবে। সাতাশে মাঘ দিন ঠিক হ'য়ে গেছে। সঙ্গে যাবে আমার দেওর। নৌকা আসবে সুন্দরবন থেকে।

একদিন সত্যি-সত্যি নৌকা এলো আমার বাপের বাড়ির গ্রামে সেই ধলাইতলার শ্মশানঘাটে। কথা হলো আমার মা-বাবার কাছে একটি দিন থেকে সুন্দরবনে চলে যাবো। শ্বশুরবাড়িতে সবার কাছে, দাদাশ্বশুরের কাছে বিদায় নিয়ে পালকিতে উঠলাম।

দু'ধারের মাঠ, তাল-খেজুরবন চোখের জলে ঝাপসা হ'য়ে গেলো।

শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি মাত্র এক ঘণ্টার পথ। বাবার কাছে গেলাম। মায়ের বড় অসুখ। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আমাকে রান্নাবান্না করতে হলো। স্বামী একনৌকা বড়-বড় কৈ-মাছ পাঠিয়েছেন। কতকগুলো শ্বশুরবাড়িতে, কতকগুলো বাপের বাড়ি দেওয়া হলো। আর কিছুটা নৌকায় থাকলো পথের জন্য।

পুঁটি পিসীমা চুল বেঁধে কাঁচপোকার টিপ পরিয়ে, আলতা-সিঁদুর দিয়ে দিলেন। দাসী, পুঁটি পিসীমার ভাইঝি। ছোট্ট ফুট-ফুটে মেয়েটি। খেজুররস এনে খাওয়ালো খুব। একটা দিন থেকে আবার সকাল বেলা পালকিতে উঠলাম।

কালীবাড়ি প্রণাম করে, পুরোনো বাড়ির মধ্য দিয়ে, ভূষণ ঠাকুরের দোকানের সামনের বকুলতলা দিয়ে পৌঁছালাম ধলাইতলার ঝাউগাছ তলায়।

দূরে শীতল কামারের আমের বাগে বউলে বউলে ছেয়ে গেছে। আমগাছের মধ্য দিয়ে শব্দ আসছে সোনা-পেটানোর মৃদু মধুর ঠুন্-ঠুন্। ও সোনা গড়ে কিনা। ঢাকাই গয়নাও গড়তে পারে।

ধলাইতলার, কৃষ্ণনগর, চুয়াডাঙার বিলের সব ধান কাটা হয়ে গেছে। এখনও কিছু কিছু নাড়া পড়ে আছে জমিতে। গোরুর জন্য সবাই বড়-বড় বোঝা করে ফুলোকুঞ্চি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে গোরুর গাড়ি বোঝাই করে। ন্যাড়া আমড়া গাছে বউল ধরেছে। পাথরকুচি পাতার বড়-বড় মঞ্জরীতে মধুভরা প্রজাপতি মধু খাচ্ছে। পাল্‌শে-মাদারের রক্ত-ফুল চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। শিমুল, সজনা ফুলও ফুটেছে। দূরে সকাল স্নিগ্ধ হাওয়ায় গা-এলিয়ে বসন্ত-কোকিল নতুন ডাকতে শুরু করেছে।

গাছের পাতা, ফুলের লতা কচি কিশলয় যেন উন্মুখ, উৎসুক। জাগরণ-বিবশা ধরিত্রী, শান্ত সুখিনী বনভূমি, কানন-কান্তার, শ্যাম

প্রান্তর প্রিয়-প্রতীক্ষামানা। উদাসী ঝাউ দীর্ঘশ্বাসে বিচ্ছেদ-বেদনায় আমায় আবার বিদায় দিলো।

একাদশীর নব-আষাঢ়ের জলভারাক্রান্ত ঝাউ, আজ নবফাল্গুনে চতুর্দশীর মধুবেদনা-মর্মরিত ঝাউ, প্রণাম তোমায়। বিদায় বন্ধু !

সন্ধ্যাবেলা নৌকা ভিড়লো বরাতিয়া গ্রামের বালি-চিকচিকে ঘাটে। গ্রামটি যেন ভদ্রনদীর পাড়েই, সঠিক নামটি মনে নেই। ছোট্ট একটি হাট বসেছে নদীর ধার দিয়ে। গ্রামের হাট। গ্রামের লোকেরাই বেচা-কেনা করছে। দু-একখানা ছোট ডিঙি-নৌকাও বেচা-কেনা করতে এসেছে এগ্রাম-সেগ্রাম থেকে। এখন গোন নেই। অপেক্ষা করতে হবে অনেকক্ষণ। উপরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে সারাদিন কাটিয়ে শেষ রাত্রের গোনে আবার নৌকা ছাড়লো। তার পরদিন সকালবেলা আমার দেওর, নৌকায় জিয়ানো কৈ-মাছের ঝাল-ঝোল রান্না করলো। বোটম্যানরা গুছিয়ে দিলো। বাড়িতে মায়ের অসুখ দেখে এসেছিলাম। মা-বাবার জন্য বড্ড মন কেমন করতে লাগলো। ভাত খেলাম না। নৌকার জানালা দিয়ে ফেলে দিলাম। খেলাম না, তা পিছন থেকে দেখলো রাখাল মাঝি। সেও সারাদিন উপোস ক'রে থাকলো। ওর নাকি নিয়ম, বাড়িতে কেউ উপবাসী থাকলে ও উপোস করেই থাকে।

ছোট্ট ডিঙি। বাইরের পরিবেশ দেখবার তেমন সুযোগ ছিলো না। তবুও দেখতাম গভীর রাত্রে নদী-আকাশের মিতালী। হরিৎ, পাটল, ধূসর মেঘ-ভরা আকাশ যেন নেমে আসতো নদীর বুকে। চলায়মান জল স্থির হ'য়ে থাকতো, শুধু বীচি ভেঙে-ভেঙে জল বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়তো সারাদেশ। আর দেখতাম, রাত পোহাবার আগে যেমন পূবে ফরসা দেয়, অমনিই সুস্নিগ্ধ আলো সুন্দর নদী আকাশে মিশে ছড়িয়ে পড়েছে দূরে—দূরে—বহু দূরে।

আর সে আলোর আকর্ষিত যাত্রী আমরা ধীরে অগ্রসর হচ্ছি কোন দূরান্তে।

তিন-চারদিন পরে একদিন নটবর বোটম্যান চীৎকার করে উঠলো, ওই আমাদের আপিসের আলো।

কিন্তু কোথায় আলো, আপিস? নৌকা তেমনি চলছে তো চলছেই।

আবার কিছুক্ষণ পরে নটবরের গলা শোনা গেলো, তোমার নৌকাটা ডুবে গেছে বুঝি? আহা, গরীব মানুষ!

চেয়ে দেখি একটি লোক অন্ধকার নদীর মধ্যে ভেসে প্রাণপণে হাতড়ে-হাতড়ে খরস্রোতের মুখ থেকে গোলপাতাগুলি ধরবার চেষ্টা করছে।

নটবরের সমবেদনায় লোকটি হাঁউমাউ করে উঠলো।

নটবর ওরা কিছু সাহায্য করলো ওকে গোলপাতাগুলি তুলবার জন্য।

আপিসে পৌঁছানো গেলো আরো কিছুক্ষণ পরে। আপিসের নাম বুড়ী গোয়ালনী।

আমাকে চাপরাসীর কোয়ার্টারে নিয়ে গেলো। চাপরাসী ব্রাহ্মণ। নাম উপেন। ওর এক ছেলে ও বউ। বউটি আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। দেখতে-শুনতে, কাজে-কর্মে বেশ একটা পরিচ্ছন্ন ভাব। সব সময় কৌতুক করা অভ্যাস। বেশ হাসি-খুশি মানুষটি।

স্বামী এতোদিন একা আপিসঘরেই থাকতেন। এখন কোয়ার্টারে থাকতে হবে। কোয়ার্টার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে।

আমার ছাই কিছুই ভালো লাগছে না। এ কয়দিন তো দেওরের পেছন-পেছন ঘুরেছি। ও হয়েছে আমার ভবের কাণ্ডারী। সারাপথ আমাকে বোঝাতে-বোঝাতে নিয়ে এসেছে।

দেওর অনেক বড়। কাজেই চাপরাসীর বাড়ির মধ্যে আসতে ও পারে না। অন্ধকারে বন-জলের রাজত্ব কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ভয়ে-ভয়ে মরছি। চাপরাসীর ঘর দেখলাম মাটির পোতা, কাঠের তৈরি। বুঝলাম, জল ওঠে না।

একটু পরে নটবর বোটম্যান আমাকে আলো ধরে নিতে এলো। বুঝলাম এরই তত্ত্বাবধানে আমায় থাকতে হবে।

কোয়ার্টারে গোলপাতার বেড়া দিয়ে খানিকটা জায়গা ঘেরা। সুপতির মতন দু'খানা তক্তার পাটলাজ করা ঘর। হাত দুই-আড়াই উঁচু। রান্নাঘরটা মাটির। চলাফেরার রাস্তা মাটি দিয়েই। ছোটো ঘরখানায় কেউ থাকে না। ভাঁড়ারের হাঁড়ি-কৌটা ভর্তি, আর বাঘ হরিণের চামড়া বোঝাই। বড় ঘরখানায় আমার জিনিস-পত্র, বিছানা পাতা।

রাত তো একরকম পোহালো, মনের আতঙ্কে সারারাত দুঃস্বপ্ন দেখলাম যেন সেই সুপতি ফরেস্ট আপিস—অক্ষয়, ঝি, উচ্ছ্বসিত ভয়াল সাত-নদীর মোহানা। স্থিরা সোলা। সেই আষাঢ়ের সজল গম্ভীর মেঘ। শ্যাম বন-শ্রেণী। আর দেখলাম, রক্তাক্ত শার্দূল।··· ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম।

স্বামী দেওরকে ডেকে দিলেন। ও এসে আমাকে কতো বোঝাতে লাগলো। তখন ভোর হয়-হয়। দেওর জানালা খুলে দিলো।

সামনে বড় নদী। প্রথম ফাল্গুনের দক্ষিণা বাতাসে নদীজল-সিক্ত। ভোরের নদী বয়ে চলেছে। ওপারে আবছা বনশ্রেণী। এ-পারে নতুন আলোয় ফুটে উঠেছে বাড়ি, ঘর, ভেড়ি। নদীর কূলে কেয়াঝাড়। শুনতে পাচ্ছি, বন্য ঝাউয়ের ভোর-স্নিগ্ধ বাতাসের শব্দ শাঁশাঁ।

নতুন ভোরে, নতুন দেশে, নতুন বাতাসে জাগলাম। মনে

হ'লো যেন কোনো রূপকথার দেশ, জল-কুমার যেন ময়ূরপঙ্খী চড়ে অলস-বাতাসে গা এলিয়ে চলেছে মৌনবতী রাজকন্যার দেশে।

নদীর ধার দিয়ে ভেড়ি। কেয়াঝাড়ের উপরেই একটি নারকোল গাছ। একটি কুল গাছ। বামে আপিস। জেটি। আপিসটা ইঁটের গাঁথনি, তক্তার পাটলাজ করা। ডাইনে আমাদের কোয়ার্টারের পিছন দিয়ে বন। চওড়া মাত্র আপিসটুকুর মতো। লম্বা অনেক মাইল ধরে, নদীর ধার দিয়ে।

শুনলাম একে বলে জমিদারী বাদা। এর অধিকারী জমিদার। আর খাস বাদা গভর্নমেণ্টের অধিকারভুক্ত। জমিদারী বনে বাঘ, হরিণ নেই। অন্য জীব-জন্তু, গাছ-পালা সবই আছে। জমিদারী বন কাটা হয় না। আপিসের ঘাটে অনেক ছোটো-ছোটো বাওয়ালী-নৌকা।

শুনলাম এখানে মাত্র তিনশত মন নৌকা পাস হয়। কিন্তু পাস হয় খুব বেশি। খাস বাদা এখান থেকে খানিকটা দূরে। তাই এখানে তেমন বাঘের ভয় নেই। মাঝে মাঝে আসে। গোরু, মানুষও নিয়ে যায়।

নদীর নাম আড় পাঙাশ। বেশ বড়ো। স্রোত ও তরঙ্গও আছে। ওপারে নাকি ছোটো একটি হাট আছে। নাম বারার হাট খোলা। সেখান থেকে আমাদের কাপড়-জামা কেনা হতো। কাপড়-জামা বেশ ভালোই পাওয়া যেতো। এই তো হ'লো আপিসের সামনে।

আপিসের বামে একটা নৌকা রাখবার সড়ক চলে গেছে চাপরাসীর কোয়ার্টারের পিছন দিয়ে। সড়কটি মনে হয় যেন একটি খাল। ছ'ধার দিয়ে বন্যগাছ নুইয়ে পড়েছে। ছায়াচ্ছন্ন সড়কটি যেমন নিভৃত, তেমনি মনোরম। ঝড়-বাদলে বাওয়ালীরা ওখানে নৌকা রাখে। সড়কের পার দিয়ে অমনি জমিদারী বাদা চলে গেছে বহু দূরে।

কোয়ার্টারের পিছন দিকে বোটম্যানদের ব্যারাক, রান্নাঘর, একটি পুকুর, খানিকটা আমার বাড়ির মধ্যের সঙ্গে ঘেরা। পুকুরটার জল খুব নোনা, ওই জলে আমি চান করতাম। খাবার, রান্নার জল ওপার থেকে নৌকা করে আসতো।

আপিসের স্থানে স্থানে দু'একটা বন্য গাছ। আপিসের পিছনে চওড়া ভেড়ি। ভেড়ি মানে, নোনা জলের বাঁধ। আমাদের ধান-ক্ষেতের আলের মতো জিনিস। আল সরু; এ উঁচু, চওড়া। জমিদারের জমি এই ভেড়ি দিয়ে ভাগ করা। গ্রামে যাবার পথও ভেড়ি দিয়ে। ওই পথ দিয়ে স্বামী জানি কোথায় যেতেন। সেখানে নাকি বাইন কাঠ চেরাই হয়।

ভেড়ির পার দিয়ে দিগন্তহারা মাঠ। দূরে বন-রেখার মতো বুড়ীগোয়ালনী গ্রাম। ওখানের অধিবাসী শুনলাম মুসলমান। মাঝে মাঝে ভেড়ির পথ দিয়ে ওরা আসতো আমাদের দেখতে। অবশ্য মেয়েরা নয়।

ওখানের একজন মুসলমান অধিবাসী ছিলো বেশ শৌখীন। তার হারমোনিয়াম এনে আমার দেওর বাজাতো। আমিও অনেক বই এনে পড়তাম। তার মধ্যে মুঞ্জা রাজার বই আমার বড় ভালো লেগেছিলো।

সকালবেলা নটবর আমাদের মাছ জীয়ানো দেখতে নিয়ে গেলো। জমা নেওয়া জমিদারী বাঁধা খালের মাছ দিয়ে গেছে জেলেরা। দেখলাম, চাপরাসীর বাড়ির পিছনে মাটির খুব বড় চৌবাচ্চায় কিলবিল করছে প্রচুর মাছ। উপরে কাঠের পেরেক-ঠোকা একটি চালি দিয়ে ঢাকা। কৈ বেশির ভাগ। কৈগুলি যেন হাতের পাতার মতো চওড়া। লম্বা আট-দশ আঙুল। এত মাছ খাওয়া ছাড়া ঝুড়ি করে কেটে বাওয়লীদের, গ্রামবাসীদের বিলিয়ে দেওয়া হয়।

এখানে দুধ মেলে না। বাজার হয় ন-বেঁকির হাট থেকে সাত-দিন অন্তর। হাট এক গোনের পথ!

একদিন একঝুড়ি পায়রা মাছ দিয়ে গেলো। আমাদের দেশে যাকে বলে চিত্রে। ওজনে একসের-পাঁচ পোয়া।—দেওর বায়না ধরলো—এগুলি আস্ত ভাজা হবে।—বিরাট ব্যাপার। এক-একটি বড় থালার মতো দেখতে। বড় কড়াই করে ডুবো তেলে ভেজে সবাইকে দেওয়া হলো। মাছেই সবটা ভাত ঢাকা পড়ে গেছে।

একদিন দু'জন বোটম্যান কাঁধে করে প্রকাণ্ড দুটো ভেটকি এনে রাখলো আমার সামনে। ওদের পেটের ভিতর আমার মতো দু'একজন স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে।

সস্তা দুধ-ঘি, বনের প্রচুর মধু জালা ভরতি, নদীর মাছ, হরিণের ও কচ্ছপের প্রচুর মাংস, হাঁসের ডিম।—এত খাদ্যের প্রাচুর্য বোধ হয় কোনো রাজবাড়িরও হয় না। সুন্দরবনের আপিসের মাছ-ভাত মানুষজন, কাক-কুকুরে খেয়ে পারে না।

এখানকার পোস্টাপিস নকীপুর ঈশ্বরীপুর। এই ঈশ্বরীপুরে যশোরের রাজা প্রত্যাপাদিত্যের কালী এখনো আছে। আর আছে ইঁটের ঢিপি। বাড়ির ধ্বংসাবশেষ।

কালীকে নিয়ে গল্প আছে। কালী নাকি চলে যাওয়ার জন্যে ছল-ছুতো খুঁজছিলেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্য না-বললে উনি যেতে পারেন না। তাই একদিন রাজসভায় মেয়ের রূপ ধরে উপস্থিত হলেন।

প্রতাপাদিত্য রাগে গর-গর করে তাড়িয়ে দিলেন। বললেন, যা যা, এখান থেকে চলে যা।

কালীও ছুতো পেয়ে চলে গেলেন। চিহ্ন রেখে গেলেন উত্তর-বাহিনী হয়ে। প্রতাপাদিত্য কালীর অবস্থা দেখে মাথা ভাঙতে লাগলেন। আর কি হবে!

এখনও সেই উত্তর-বাহিনী কালী আছে যশোরের যমুনা নদীর ধারে। আর এই যমুনার মধ্যে এখনও রাজবাড়ির গুপ্ত সুড়ঙ্গের পথ জঙ্গলের ভেতর দেখা যায়।

একদিন সুন্দরবনের দুই সাহেব এলেন 'হক' 'হেরিয়ার' দু'খানি স্টীমারে চড়ে। কনজারভেটর ফ্যারিংটন সাহেব থাকেন দার্জিলিংয়ে। ডেপুটি কনজারভেটর ক্যারল সাহেব থাকেন খুলনায়। আপিস থেকে ভেটকি মাছ দেওয়া হলো সাহেবদের। শিকারীরা যে সব বাঘ মারে, তার চামড়া আপিসে জমা থাকে। সেই চামড়াগুলি নিয়ে গেলেন সাহেবরা। পুরস্কার দিলেন চামড়া পিছু দু'শো, ছোট চামড়া পঞ্চাশ টাকা করে।

সেই বাঘের মসৃণ ডোরাকাটা চামড়াগুলিতে আমি হাত দিয়ে দেখতাম আর ভাবতাম, এতো সুন্দর বিচিত্র, তবু কেন এতো হিংস্র ওরা।

এই বাঘের চামড়াগুলির মালিক নকীপুরের নছিমুদ্দী শিকারী। ও প্রায় সময় আমাদের আপিসেই থাকতো আর বাবুদের সঙ্গে বনে বাঘ শিকার করতো।

নছিমুদ্দীর একটা হাত ছিলো না। ও এক হাত দিয়েই বন্দুক বুকে বাধিয়ে গুলি করতো। ওর লক্ষ্য ছিলো অব্যর্থ। আপিসের যত হরিণ ও-ই শিকার করতো। ছোটবেলা থেকে এই বাঘ শিকারই ওর জীবিকা। কিন্তু এই শিকারের জন্যই একদিন ঐ হাতখানি খোয়া গিয়েছিলো ওর।

সেদিন ও গভীর বনেই শিকার করতে গিয়েছিলো। ওর দুর্বুদ্ধি! ছোট্ট একটা ওড়া গাছে চড়ে ঝুঁকে বেনা ঝাড়ের মধ্যে বাঘকে গুলি করলো। বাঘটা ছিলো খুব বড় ও তেজী। গুলি খেয়ে আঁক করে ওড়া গাছ থেকে ওকে পেড়ে নিয়ে বুকের তলায় নিয়ে বসলো।

কিন্তু নছিমুদ্দীর অসীম সাহস। ও একখানা হাত বাঘটার মুখের ভেতর পুরে দিলো, আর একটা হাত দিয়ে বন্দুকে গুলি ভরে বুকে বাধিয়ে আবার গুলি করলো বাঘের বুকে।

এইবার বাঘকে আঁক করে আছড়ে পড়ে মরতে হলো। কিন্তু ওর হাতের হাড়খানা তখন আর আস্ত নেই। বাঘ চিবিয়ে চিবিয়ে ফেস্টো করে দিয়েছে।

টাকাগুলি ওকে দেওয়া হলো। ওর অনেকদিনের শ্রম কষ্টের মূল্য।

সেদিন সাহেবদের তুখানা স্টীমার দেখাচ্ছিলো আলোকোজ্জ্বল বাড়ির মতো। ফ্যারিংটন সাহেব বড় একটা কুমির মেরে নিয়ে গিয়েছিলেন আপিসের ঘাট থেকে।

আমরা একদিন কদমতলা ফরেস্ট আপিসে বেড়াতে গেলাম। কদমতলা বুড়ীগোয়ালনীর মতো আর একটি আপিস। সেখানে একজন ব্রাহ্মণবাবু ছিলেন। নাম তার সতীশবাবু। ওঁদের ছেলেপুলে নেই। ওঁরা আমাদের খুব যত্ন অভর্থনা করলেন।

খাই-দাই, থাকি। মানুষ দেখতে পাই মাত্র আপিসের লোকগুলি আর বাওয়ালীরা। এবার তো আমার খুব লজ্জা হয়েছে, আমি বাইরেও যাইনে, কারও সাথে কথাও বলিনে। ঘোমটা দিয়ে বউ হয়ে বাড়ির মধ্যেই থাকি। মাঝে-মাঝে চাপরাসীর বউ ছেলের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করি।

আর কথা বলি নটবরের সঙ্গে। ও জাতে নাপিত। ওর ধূর্তামির চেয়ে বোকামিই যেন বেশির ভাগ। অবশ্য নটবর সব সময় বুদ্ধিমানের মতো একটি প্রবাদ বাক্য বলতো—জগৎ আনন্দময়, যার মনে যা হয়। তবে কিছুটা ধূর্তামি ছিলো ওর ভিতর। এই যেমন আমার রক্ষণারেক্ষণের ভার নিয়েছিলো ও সাগ্রহে। তার মানে,

নৌকার দাঁড় টানার দায় বেঁচে গেলো! বিনা পরিশ্রমে আমাকে দেখাশুনা করে দিন কাটবে!

নটবরের চেহারা গোল-গাল। কালো একজোড়া গোঁফ। চোখ ছ'টো লাল। মধ্য-বয়সী।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে। কালীগঞ্জের দিকে বাড়ি।

প্রায় একমাস হ'তে চললো দেওরকে বাড়ি যাওয়ার জন্য শ্বশুর চিঠি লিখেছেন। এতোদিন ওর পেছনে পেছন ঘুরতাম, গল্প-সল্প করতাম, একরকম দিন কাটতো, এখন একেবারে একা। এই একমাসের মধ্যে চাপরাসীর স্ত্রী ভিন্ন কোনো মেয়েলোকের নিশানা দেখিনি।

গ্রাম বহুদূরে। তেপান্তর মাঠের ওপারে। গ্রাম সেই থেকে মাঝে-মাঝে পুরুষরা আসতো। অবশ্য ওদের কোনো কাজ নেই আমাদের কাছে।

দেওর বাড়ি যাবে। সব গোছানো হয়ে গেছে। মনটা বড় খারাপ। কান্না শুরু করেছি। ও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছপুরবেলা আমাকে ঘুমিয়ে দিলো।

কেঁদে-কেটে ঘুমিয়ে পড়েছি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি তার ঠিক নেই। হঠাৎ জেগে দেখি, দেওর তো নেই-ই আর নটবরটাও কোথায় জানি গেছে। আপিসে স্বামীরও সাড়া নেই। বাইরে ছ-এক জন বোটম্যান ঘুরছে মাত্র। ওদের সঙ্গে কথাও বলি না। অবাক হয়ে গেলাম। ভাবছি নদীর মধ্যে নৌকা দেখতে হয়তো গেছে। স্বামী মাঝে-মাঝে যেতেন। কিন্তু এরা গেলো কোথায়?

সন্ধ্যা হয়-হয়। তবুও আসে না। রাত হ'য়ে গেলো। আসে না। তখন কান্নায় ভেঙে পড়লাম। সে কী কান্না! সারা জীবনে অমনি করে কাঁদিনি। ভাবলাম ওরা ছ-ভাই আমায় ফেলে

নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে। কিন্তু আমি তো কোনো অপরাধ করিনি। কেন আমায় বনের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেলো? চোখে তো সপ্ত-সমুদ্র নামলো। তবু ভেবে পাইনে। পা আছড়ে-আছড়ে কাঁদছি। সন্ধ্যার আঁধারে কেউ আলোও দেয়নি। ভয়ও করছে খুব। মাঝে-মাঝে বাঘে মানুষ নিয়ে যায় এখান থেকে। দরজাটা খিল লাগিয়ে দিলাম।

এর মধ্যে বন-ঝাউয়ের বাতাসের সঙ্গে কিসের শব্দ পেলাম। আলোক উজ্জ্বল একটি স্টীমার লাগলো ঘাটে। হৈ-হৈ করতে করতে তো নামলো নটবর। আগে স্বামী, দেওর আর একটি অপূর্ব রূপবান ইংরেজ যুবক।

নটবর আমার অবস্থা দেখে অনুশোচনায়-দুঃখে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। বারে-বারে বলতে লাগলো, না-বলে যাওয়া অন্যায় হয়েছে, মা। ঘুমুচ্ছিলেন, তাই। এত রাত্তির হবে তা তো বুঝিনি, ইত্যাদি।

শুনলাম, সাহেবটি এসেছেন সুন্দর বনের গাছের অসুখ সারাতে। যেসব গাছে পোকা ধরেছে, সেই সব গাছে ওষুধ দিয়ে এলেন। ইনি একজন বৃক্ষ-চিকিৎসক। নাম জেণ্ট। স্বামী গিয়েছিলেন। তাঁর নৈমিত্তিক কর্মসূচীতে। দেওর গিয়েছিলো দেখতে। আর নটবর সাহেবের সাথে গিয়েছিলো ওষুধ দিতে।

আর আমি মরলাম অকারণ কেঁদে।

সত্যি-সত্যি দেওর একদিন খুলনার পথে চলে গেলো। আমাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শিগ্‌গির নিয়ে যাবে, বলে গেলো। খুলনা থেকে অনেক জিনিস পত্তর পাঠিয়ে দিয়ে গেলো! জামা-কাপড়, টিয়ে-রঙা চিরুনী। জুঁইফুল সাবান, কতরকম তেল-আলতা-ফিতে, ছাই-মাটি।

আমি একেবারেই একা। কোনো কিছুতেই আমার মন ভোলে না। দিন-রাত কেঁদেকেটে মরি। নটবর আমাকে দেখাশুনা করে। খুব যত্ন করে দুধ-চিঁড়ে খাওয়ায়। নবেঁকীর হাট থেকে আমার জন্য নানারকম ফল-ফুলুরি, সন্দেশ মিঠাই আনায়। আর আনায় কাগজের বাক্সে ডজন-ডজন সবুজ রঙের রেশমী চুড়ি। পরিয়ে দিয়ে বলে, ফরসা হাতে নাকি খুব ভালো দেখায়। সুরেন ঠাকুরও আমাকে মাছের মাথা, ভালো জিনিস বেছে-বেছে খাওয়ায়। মানুষ যেমন ছোটো ছেলেদের খাবার দিয়ে তাতে একটু রঙ্গ করে, ওরা আমায় নিয়ে তেমনি করে।

নটবর আমাকে একটা কচ্ছপ এনে দিলো। সেটাকে রেখেছিলাম জলের ড্রামের ভিতর। চারটে হাঁস ছিলো। তারা থাকতো আমার ঘরের পাঠাতনের নিচে ভাঙা জলের মেঠের মধ্যে। আমার সঙ্গীহীন দিনে ওরাই আমার সাথী হলো।

ঝড়ে আপিসের বারান্দা ধসে গেছে। কোথা থেকে ইঁট আনছে ডিঙি করে। নটবরের কাছে শুনলাম, ত্রিকাঠীর জটিল থেকে। ত্রিকাঠীর বাদায় নাকি ভাঙা-ভাঙা দালানবাড়ি, দোতলা বাড়ি আছে। তার মধ্যে সাপ-বাঘও আছে। ইঁটগুলি সাধারণ ইঁটের চেয়ে বড় ও শক্ত। লাল টুকটুকে।

আশ্চর্য! ইঁটগুলি অবিকৃত। তার চেয়ে আশ্চর্য এখনও নাকি সেখানে বেল, মানকচু, গাঁদাফুল, তুলসী—মানুষের রচিত জঙ্গল আছে। ওদের ধ্বংস করতে পারেনি বনের আবেষ্টনী। ভাবি, কত যুগ-যুগান্ত, কত কাল আগের নদীতটে এই গ্রাম কি নগর। হয়তো ঐ তুলসীতলায় একদিন দীপ জ্বালতো কোনও গ্রামের মেয়ে।

বনের মধ্যে বহু জায়গায় ইঁটের স্তূপ পাওয়া যায়। বুড়ী গোয়ালনী ফরেস্ট আপিসের খুব নিকটে ছিলো এক ত্রিকাঠীর জঙ্গল।

আগে-আগে সুরেন ঠাকুর বাড়ির মধ্যে রান্না করতো, এখন করে বাইরে রান্নাঘরে। ভাত এনে দুবেলা দিয়ে যায় আমাকে। স্বামী বাইরের রান্নাঘরেই খান।

আমার বেশ সুবিধা হয়েছে। সাথীদের নিয়ে বেশ নির্জনে কাটাই। রোজ বিকেলবেলা কচ্ছপটাকে বের করে হরিণের চামড়ার ওপর বসাই, চন্দন পরিয়ে পুরুতঠাকুর সাজাই। ও মাঝে-মাঝে মুণ্ডুটা বের করে চোখ পিট্‌পিট্ করে। আমি বলি, ঠাকুর মশাই, পুজো করো। ও অমনি মুণ্ডুটা খোপের মধ্যে নেয়। পুজোর উপকরণ আমার বৈকালের জল-খাবারটা। কিন্তু ফুল যোগাড় করতে পারছিনে কোনো রকমে। সম্বল মাত্র দূর্বা-চন্দন। এখন ফুল কোথায় পাই? এক বুদ্ধি মাথায় গজিয়ে উঠলো।

চৈত্রের প্রথম। পূর্ণ বসন্ত নেমেছে বনে। পুষ্পাকীর্ণ বনভূমি। পাতা-ঝরা গাছে শুধু ফুল-সমারোহ। আমার বাথরুমের পিছনের জমিদারী বাদা ছেয়ে গেছে ফুলে-ফুলে।

আমি একদিন বিকালবেলা আমার একখানা কাপড় ঘরের বারান্দায় রেখে বনে ঢুকে গেলাম ফুল আনতে। নটবরটা এসে মনে করবে আমার কাপড় দেখে—আমি বাথরুমে গেছি। বেশ মজা হবে কিন্তু। সেদিন ফুল নিয়ে এসে পুজো করলাম।

এমনি রোজ যাই। স্বামী ও বেলা তিনটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আসেন না। এখানে কাজের ভিড় খুব। নটবরটাও ঘণ্টা না বাজালে আসে না। নেহাত কোনো বিশেষ কাজে এলে আমার কাপড় দেখেই তো ফিরে যাবে। এখানে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় সামান্য একটু জোয়ারের জল ওঠে। দু'একটা ম্যানামাছ তিড়িং-তিড়িং করে। একটু পরেই জল সরে যায়।

এই জমিদারী বনের মধ্যে শুলো নেই। গোল গাছও নেই।

হরিণ-বাঘও নেই। আর সব আছে। বসন্তের পাতা-শূন্য বন যেন আমাদের দেশের আম-কাঁঠাল বনের মতো লাগে। বনের ভিতর বেশ শুকনো, ফাঁকা-ফাঁকা। সব গাছ এখন ফুলে পূর্ণ। কেওড়া, ওড়া, গেঁও, গরাণ—সব গাছই ফুলে ভারাক্রান্ত। সবচেয়ে সুন্দর দেখাতো ফুলপটি লতার ফুল। লাল, নীল, হলুদ রঙা ফুলপটি লতা বনের গাছগুলিতে বেড়ে আছে। মৌমাছি, প্রজাপতি আকণ্ঠ মধু খাচ্ছে গুনগুন করে।

রোজ বন থেকে ফুল এনে মালা গাঁথি। কচ্ছপ ঠাকুর, হাঁসদের পরাই। নিজেও হাতে, কানে পরি। ক্রমে নিকটের লতা ফুল ফুরিয়ে যাচ্ছে। একটু দূরে-দূরে লতা ঝোপে কতরকম ছোট পাখি কিচির-মিচির করে। বাবুই পাখিরা সুন্দর-সুন্দর বাসা বেঁধেছে কেওড়া গাছে। গাং-শালিক, বন-টিয়েরাও বাসা বেঁধেছে লোহাগড়া ডালে। নীলকণ্ঠ পাখিরাও ডিম পেড়েছে ছোট গাছের পাতায়। মৌমাছিরা মধু-চাক রচনা করেছে বড়-বড় গাছের কোটরে। কেবল নেই বসন্তরাজ কোকিলের সাড়া। মনে পড়ে না সুন্দরবনে কোকিলের ডাক শুনেছি।

নিত্য যাই বনে। রোজই দেখা হয় এক ঘড়িয়াল দম্পতির সঙ্গে। আমাকে দেখে ওরা জিভ মেলে গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে। ওদের চলা দেখে হাসি যা পায়!

ছুট্‌কো-ছাট্‌কা দু'একটা সাপের সঙ্গেও দেখা হয়। ওরা আমাকে দেখে পালিয়ে যায়। বনের পিছনে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। সামনে বড় আড় পাঙাশ নদী। গাছগুলিতে লতা নেই। বনভূমি আলোকোজ্জ্বল।

রোজ ফুল তুলতে-তুলতে সামনে একটু একটু করে এগিয়ে যাই। প্রায় মাইল খানেক বনের মধ্যে চলা-ফেরা করি। রোজ নতুন-নতুন লতা ফুল দেখতে পাই। সৌগন্ধে বনফুলগুলি

আমায় আকৃষ্ট করে। আলেয়ার মতো নিয়ে যায় দূর হতে দূরে।

একদিন দেখা হলো একটি মজার জন্তুর সঙ্গে। আয়তনে শেয়ালের মতোই। গায়ে ডোরা কাটা বাঘের মতো। মুখখানা কতকটা আমাদের দেশের কেঁদোর মতো। জন্তুটা আমায় চেয়ে-চেয়ে দেখে আর সামনে এগোয়। যায় আর পিছন ফিরে-ফিরে চায়। ওর চাওয়ার ভাব এমনি বিস্মিত—ও যেন মানুষ দেখেনি জীবনে। আমিও কম আশ্চর্য হইনি ওকে দেখে, ওর চাওয়া দেখে। কাজেই দু'জনের বিস্ময়াবিষ্ট চোখের বিনিময় মনে পড়লে এখনো না-হেসে পারিনে।

প্রতিদিন যাই-আসি। একদিন বেশ একটু দূরে গেলাম। নদীর ধারে-ধারে ঘন কেয়া-ঝাড়ে ঘেরা। নদী দেখা যায় না। বন ঝাউ ঝোপে-ঝোপে-মেশামেশি। জায়গাটা কেমন-কেমন, আঁধার-আঁধার।

তার একটু দূরে একটা মজার জিনিস দেখলাম। একটা জায়গা বেশ উঁচু ঢিবির মতো। তার উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ। গাছগুলি বন্য লতা-বেষ্টিত। গাছ লতা-পুষ্পময়। ভোমরা, মৌমাছিরা গুন-গুন করছে। বন্য পাখিরা কিচির-মিচির করে উড়ে-উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গাছে গাছে।

বন্য ফুলের মৃদুগন্ধ-সুরভিত শান্ত-শীতল স্থানটিকে যেন মনে হয় কোনো দেবালয়। কি একটা পাতা-লতার সৌগন্ধে আমি যেন কেমন হ'য়ে গেলাম! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম তারও ঠিক নেই। হুঁশ হলো আমার সেই বিস্ময়াবিষ্ট জন্তুটিকে আবার দেখে।

সেদিনও সে আমার দিকে চেয়ে-চেয়ে পালিয়ে গেলো। জন্তুটির অবস্থা দেখে সেদিন আমার মনে হয়েছিলো, ও যেন আমার প্রেমে পড়েছে। কিছুতেই আমায় ছেড়ে যেতে চায় না। কিন্তু তারপর যা শুনেছিলাম—তা সত্যই ও আমার রক্তের প্রেমে পড়েছিলো।

ওর নাম নাকি বাগরোল। মানুষের গন্ধ ওর হিংস্র রক্তকে আকর্ষণ করছিলো। কি ভাগ্য ও আমায় কিছু বলেনি। হয়তো ও জাতে শিশু ছিলো, কি সাহস করতে পারেনি।

বেলা শেষ হয়ে এসেছে। শীঘ্রই ফিরতে হবে। আর আগেই ফুল পেয়েছিলামও প্রচুর। সেদিন ফিরলাম। কিন্তু মন পড়ে থাকলো ওই মনোরম স্থানটিতে।

ফিরে এসে হাঁস-কচ্ছপের সঙ্গে খেলতে আর মন চাইল না। সব সময় ওই স্বপ্নময় স্থানটির আর লতা-পুষ্পের সৌগন্ধ আমায় আকর্ষণ করতে লাগলো।

রাত্রে কিছু খেলাম না। নটবর বার বার আমার শরীরের অসুস্থতা জানতে চাইলো। বললাম, তেমন খিদে নেই, শরীরও ভালো নেই।

রাত্রে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম, আমি যেন ওখানে গেছি। কতগুলি আমার মতো মেয়ে, ফুলের গহনা পরে, বাঁশী-বীণা বাজিয়ে ঘুরে-ঘুরে নেচে-নেচে গান গাইছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওদের! যেন ফুলের মুকুট পরা রানী। কী চমৎকার ওদের গানের সুর।

আমাকে দেখে ওরা যেন হেসে-হেসে ভাব করতে এলো। আমাকেও অমনি ফুলের মালা পরিয়ে দিলো। মাথায় দিল সিঁথি। গলায় হার। কেওড়া ফুলের ঝুমকো দিল কানে। চুলে জড়িয়ে দিল লাল টুকটুকে লতা-ফুলের মালা।

আমিও ওদের সঙ্গে নাচতে-গাইতে লাগলাম। মনে আনন্দ আর ধরছে না। আমি যে কে তা ভুলেই গেছি। ওরাই যেন শুধু আমার সই।

নাচে-গানে, বেনু-বীণার সুরে, ফুলের সৌরভে, দক্ষিণা বাতাসে, আমরা যেন হারিয়ে গেছি। পিছনের কোনো কিছুই

মনে নেই। শুধু নাচ—হাতে-হাতে, মাথায়-মাথায়, হাত ধরা-ধরি করে নেচে চলেছি।

হঠাৎ লণ্ড-ভণ্ড করে দিলো বাগরোল শিশুটি। আঁচড়ে-কামড়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিতে লাগলো। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম নদীর জলে।

ঘুম ভেঙে গেলো। ভোর হ'য়ে গেছে। সমস্তটা দিন একটা মেশামেশি ভয় ও আনন্দে কাটলো। আনন্দের কারণ বন-মেয়েদের নাচ গান। স্বপ্নে স্বপ্ন-মেয়েদের কি ভালোই লেগেছিলো। ভয় বাগরোল হতভাগাটাকে নিয়ে। ও জানি এদিকে কোথায় থাকে, আঁচড়ে দিতেও তো পারে।

সেদিন সকাল করেই বেরিয়ে পড়লাম। খুব সুবিধাও হলো। নটবরটা গেছে নকীপুরে ডাক আনতে। আর স্বামীরও কাজের ভিড় বেশি রকম বেড়েছে। কাঠ পাতা বাদে এখন মধুর নৌকোও পাস হচ্ছে অনেক।

আমার পরম সুযোগ। শাড়িটা সামনের বেড়াটায় ঝুলিয়ে স্বপ্নের আনন্দে মন ভরপুর করে ঢুকলাম বনে। কোন্ সময় যেয়ে দাঁড়ালাম ভ্রমরগুঞ্জিত ফুলপুষ্প মণ্ডপের ধারে। গাছে ফুল, লতায় ফুল, পাতায় ফুল ; শুধু ফুল। ফুলের ভারে গাছগুলি নুইয়ে পড়েছে। লতাদের সাথে হাত ধরা-ধরি করে আছে। লাল, নীল, সাদা, হলদে ফুল একশা হ'য়ে গেছে গাছে লতায়। মনে হচ্ছে যেন সম্পূর্ণ পুষ্প-মণ্ডপটি একটি বড় পুষ্পস্তবক। সৌগন্ধে মন উতল হয়ে উঠলো। আনন্দে হাত বাড়ালাম ফুল তুলতে।

··সে কী কাণ্ড! ছপাৎ করে লতাটি সরে গেলো বহু দূরে। ঝুপঝাপ, ছুপ্ দাপ্ ছপাৎ শব্দে পুষ্পময় লতা গাছগুলি হঠাৎ আন্দোলিত হ'তে লাগলো। ভয়ে ছিটকে এসে পড়লাম বহুদূরে। যেন হতভম্ব হ'য়ে গেছি। মনে করলাম হঠাৎ ঝড় এলো বুঝি। কিন্তু চেয়ে দেখি বনের একটি পাতাও নড়ছে না।

প্রথম চৈত্রের রৌদ্র তপ্ত দুপুর। চারিদিকে খাঁখাঁ করছে। শুধু ওই জায়গাটায় ঝড় বইছে। ভয়ে, বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেলাম।

দিনের বেলা, তায়, বনের দু'দিক ফাঁকা। আরও খানিক দূরে, মাঠের দিকে এসে দাঁড়ালাম। আন্দোলনটা নীরব হ'য়ে হয়ে যেমন ছিলো লতা-মণ্ডপ তেমনি স্থির হয়ে গেলো।

আমি বিরস তিক্ত, ভীতি বিহ্বল, মন নিয়ে অসাড় পা টেনে টেনে ঘরে ফিরলাম। ফুল তোলার সাধ উবে গেলো।

ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলাম বিছানায়। সন্ধ্যাবেলা নটবর নকীপুর থেকে ফিরে আলো দিতে এসে আমায় দেখে চমকে উঠলো। বললে আমার শরীর নাকি আধখানা হয়ে গেছে। বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলো আমার কি হয়েছে।

আমি সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে সত্য কথা বললাম: বাথরুমের পিছনে ওই ডোরা কাটা জন্তুটাকে দেখে বড় ভয় পেয়েছি।

ও আমায় সাহস দিয়ে বললে, কোন ভয় নেই মা, ও বিশেষ কিছুই করতে পারে না। বেড়াল-টেড়াল দু-একটা জন্তু নিয়ে যেতে পারে। ও রকম বাগরোল ওরা দু-দশটা লাঠি পেটা করে মেরে ফেলতে পারে, ইত্যাদি। আসল কথা তো জানালো না!

সীতানাথ বোটম্যান নটবরের স্বজাতি। ও খুব গুণিন্। নটবর ওর কাছ থেকে জল ও পাট পড়ে এনে দিলো।

ও আমায় নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করতো। আজকের আমার এই দশায় ওর বড় বাজলো।

নটবর রোজ সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আমায় চৌকি দিতো। বনবাদাড়ের নানা রকম গল্প শুনতাম ওর কাছে। জিজ্ঞাসা করলাম পিছনের এই সামান্য বনটুকু কেন কাটে না,—সবই তো আবাদ হয়ে গেছে।

ও কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলো। বললো, এখানে যে তিনি সাক্ষেৎ আছেন! আবার প্রণাম করলো।

আমি বললাম, কে তিনি?

বনবিবি।

বুঝলাম বনের দেবী। তাঁকে এত ভয় কেন? ও কোনো কথা খুলে বললো না সেদিন। শুধু সভয়ে বার বার প্রণাম করতে লাগলো।

শুক্রবার নবেঁকীর হাট থেকে আমাকে একখানা বনবিবির পুঁথি এনে দিলো। সব কথা আমার মনে নেই। বনবিবি বনের দেবী। বাওয়ালীরা তাঁর পুজো করে কাঠ কাটতে যায়। পাঁঠা, মুরগী বাতাসার ভোজ দেয়। চুষিকাঠি, তেলাকুচো, আলতা তাগিতে গেঁথে বনবিবির গাছে পরিয়ে দেয়। বনবিবির দয়ায় বাওয়ালীরা অনেক বিপদ উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু দক্ষিণরায় বলে এক অপদেবতা আছে। বাঘের রূপ ধরে নানা রকম ভয় দেখিয়ে মানুষ মেরে ফেলে। তুখে বলে একটি ছেলেকে দক্ষিণরায় বড় নাজেহাল করেছিলো। কিন্তু সে বনবিবির ভক্ত ছিলো, সেই জন্য শেষ পর্যন্ত তার কিছু করতে পারলো না। কিন্তু তার একশত সাত জালা মধু মধুখালি নদীর মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো।

নটবরের কাছে শুনলাম এখনো মধুখালি নদীর জল মিষ্টি। চারিদিকে নোনা জল, মাঝ নদীর খানিকটা জায়গায় জল মিষ্টি। পুঁথি পড়ে, শুনে আর দেখে বনে যাওয়ার আর সাধ থাকলো না।

হাঁস চারটে সারা জায়গায় ঘোরে। ছাই-গাদার পরে দূর্বার ওপর কেমন ডিম পাড়ে। একদিন একটা আস্ত হাঁস মুখে করে একটা সাপ উঠেছে ওড়া গাছে। আফিসের লোকেরা ছাড়িয়ে আনলো। কয়েকদিন পরে হাঁসটি গেলো মারা। আমার খেলার সাথীর মৃত্যুতে বড় কষ্ট হয়েছিলো। কচ্ছপটাও ওরা নিয়ে খেয়ে ফেললো।

আমি বড় মনের দুঃখে ঘুরে বেড়াই। স্নান করবার সময় বড় বড় টেংরা মাছ ওঠে আমার মগের মধ্যে। ওদের সাথে একটু খেলি। নটবরের সঙ্গে রোজ সন্ধ্যায় গল্প করি। একদিন তাও বিঘ্ন ঘটলো।

নটবর দিনরাত হুঁকো খায়। সেজন্য, কিজন্য ওর চোখ দুটো খুব লাল। ও আমার সঙ্গে গল্প করছে মাটিতে বসে। আমি খাটে শুয়ে শুয়ে শুনছি। হঠাৎ ওর চোখ দুটো উর্ধ্ব মুখো হয়ে উল্‌টে গেলো! ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

সবাই ছুটে এলো। ও উঠে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা করে জানা গেলো, ওটা ওর ঘুম! ও নাকি চোখ মেলে, বসে দাঁড়িয়ে ঘুমুতে পারে। ও যখন ভোর-রাত্রে ডাক নিয়ে যায় নকীপুরে এমনি চোখ মেলে ঘুমুতে ঘুমুতে যায়! কিন্তু আমি যে ভয়ে মরি!

নটবর একদিন লাল টুকটুকে একগেলাস খেজুর চিনিপানা এনে বললে, মা, খেয়ে দেখুন ভালো চিনির জল।

খেয়ে বেকুব। একটুও চিনিপানা নয়। বনের মধ্যের কোন বহুকালের কাশীর দীঘির জল। পানার গন্ধ-সুরভিত সুমিষ্ট জলটুকু খুব ভালো লাগলো।

নদীর ধারে জোয়ারী পাখিরা ডাকে—পুত্‌ পুত্‌। শুনতে খুব ভালো লাগে। প্রবাদ আছে: নদীর মধ্যে পাখি তার ছেলেকে ভাটির সময় শুইয়ে কি করছিলো, জোয়ার এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো ছেলেটিকে। পাখি তো মানুষ ছিলো তখন, শোকে পাখি গাছে কোল দিয়ে পাখি হয়ে সেই থেকে ডাকছে—

ভাঁটিতে রাখলাম পুত
জোয়ারে নিয়ে গেলো পুত
পুত—পুত

ওর ডাকের সঙ্গে কথাগুলি মিলিয়ে দেখলে মনে হবে সত্যি যেন তাই।

চৈত্রের তন্দ্রালু রাত্রে নিদ্রালস নদীর নৈঃশব্দ্যে কাঠ-ঠোকরা পাখি ডেকে চলে—ঠোকোর-ঠোকোর। ক্লান্ত দুপুরে উদাসী ঝাউ মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দূরে—বহু দূরে কোন্ রাখাল ছেলের বংশীমুখর ছায়াচ্ছন্ন মাঠের প্রান্তে। যৌবন সুরভিত দক্ষিণা বাতাস নদী বনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে সন্ধ্যায়।

দু'একখানা মধুপাসের নৌকা ফিরছে। যাবার বেলা সুন্দর, স্বচ্ছ, সাদা রঙের মধু দিয়ে যাচ্ছে। ও নাকি ফুলপটি লতার মধু। চাকসুদ্ধ মধু চুষে খেতে বেশ লাগে। নটবর শিখিয়েছিলো আমাকে।

নটবর অনুরোধ করে একদিন হরিণের মাংস খাওয়ালো আমাকে। কেওড়া ফল খেয়ে খেয়ে হরিণের মাংস বড্ড টক। আর কোনোদিন খাইনি জীবনে।

লতামণ্ডপের অশরীরীদের ওই কাণ্ডটায় মনটাকে আমার বড় ভয়াতুর করেছিলো। সাথীরাও মরে গেলো। কিছুই ভালো লাগছিলো না। মাঝে-মাঝে দেশের চিঠি পেতাম। সেই চিঠিগুলি পড়ে যা শান্তি পেতাম। অমনি এক চিঠিতে দাদাশ্বশুরের মৃত্যু-সংবাদ পেলাম। বড় ব্যথা লাগলো। ছোটোবেলা থেকে গল্প বলে মানুষ করেছেন।

খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ হলো। আমার এ বনবাস থেকে যাওয়া হলো না।

আমার স্বজনহীন নির্বাসন দণ্ডে মন যেন হাঁপিয়ে উঠলো। এমন সময়ে নতুন ঘটনা ঘটলো। স্বামী বদলী হলেন সাহেবখালি ফরেস্ট আপিসে। জেলা চব্বিশ পরগনা।

কয়েকদিন পর চলে যাবো। নটবর মুখখানা আঁধার করে বললে, মা, এতোদিন ছুটিতে ছেলে-মেয়ে দেখতেও যাইনি। ভাবি ছেলে-মানুষ কষ্ট হবে। আর এখন তো কোনো কাজই থাকবে না। নিশ্চিন্তে যেতে পারবো!

বহুদিন পরে মনে পড়লো অক্ষয়ের কথা। কোথায় আছে কে জানে? ওদের এই পিতৃহৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহের তুলনা খুঁজে পেলাম না কোনোদিন।

কালবৈশাখী এলো। কড়-কড় করে মেঘ ডাকলো। প্রান্তরে ধুলো উড়িয়ে, বন আন্দোলিত করে, নদীকে তরঙ্গায়িত করে ঝড় এলো। আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়ে শিলাবৃষ্টি নামলো।

ঝড়-বৃষ্টি থামলো। শান্ত, নীরব হলো অরণ্যদেশ। শিলাপুষ্প ফুটে থাকলো দূর্বার পরে। নতুন বৃষ্টির ভেজা মাটির সুগন্ধে মন উতল হয়ে উঠলো।

ছোটো-বড় কত খণ্ড শিলা কুড়োলাম নটবর, আমি। এক-একখানা বড় ইটের চারভাগের একভাগের মতো এক-একটা শিলা পড়েছিলো। সেদিন ছোট শিল দিয়ে মোয়া বেঁধে দিয়েছিল নটবর।

একদিন বিদায় মুহূর্ত এলো। স্বামীর বদলে যিনি আসবেন তিনি এলেন। নাম লক্ষ্মণবাবু। বৈশাখের দুপুরে আমরা রওনা হলাম সাহেবখালির উদ্দেশ্যে।

নটবর বার বার পৌঁছা-সংবাদ দিতে বললো। এই স্নেহাতুর মানুষটিকে ছেড়ে যেতে আজ আর মন চাইছিলো না।

চোখের জলের সাথে বন-প্রান্তর ঝাপসা হয়ে দূরে সরে গেলো।

সন্ধিবুড়ী

বৈকালবেলা নবেঁকীর হাটে নৌকো নোঙর করলো। ওখানে খাওয়া-দাওয়া সারতে হবে।

রান্না হয়ে গেছে। সবাই খাওয়ার জন্য প্রস্তুত। শাঁ-শাঁ শব্দে ঝড় নামলো। হাটের ধুলোয়-ধুলোয় একাকার হয়ে গেলো। নৌকা কর্দমাক্ত 'নৌকা-রাখা-সড়কে' টেনে তুললো। সারা সন্ধ্যাটা শুধুই ঝড় খেলাম।

ঝড়ের সময় নটবরের কথা মনে পড়তে লাগলো। স্নেহশীল বোকা মানুষটি এমনি সময় আমার চৌকিদার হয়ে বসে থাকতো।

মাঠ, বন, নদী। মাঝে-মাঝে নদীর মধ্যে তক্তার পাটাতন করা ঘাট। কোথায় হয়তো কেওড়া ফুল-ভারক্রান্ত ডালগুলি নুইয়ে পড়েছে ঘাটের ওপর। ওই নির্জন নদীর ঘাট বড় ভালো লেগেছিলো সেদিন। শুনলাম ওই ঘাটগুলি জমিদারি কাছারির ঘাট। দু'একটা গোরু দেখতে পাই, মানুষের দেখা বড় একটা মেলে না। নদীর দুপারেই প্রান্তর। আবাদ হয়ে গেছে এদিকে। এক জায়গায় দেখলাম একটা মৃত ছোটো মেয়ের চুলে ক্ষুর দিচ্ছে। বুঝলাম, এটা শ্মশান। কিন্তু শ্মশানের কোনো চিহ্ন নেই।

সন্ধ্যা হয়-হয়। কালীগঞ্জের থানায় পৌঁছলাম। এই থানাটি যমুনা নদীর ওপর। এই যমুনা একদিন খুব বড় নদী ছিলো। দু'পারে চড়া পড়ে গেছে এখন। চড়ায় ধান হয় যথেষ্ট। মরে গেলে কি হয়। এই ছোট্ট নদীর প্রখর স্রোত দেখে আশ্চর্য হতে হয়। এই যমুনা, যশোর প্রতাপাদিত্যের বাড়ির নিচে দিয়ে বয়ে গেছে।

সেদিন সারা সন্ধ্যাটা কালীগঞ্জের থানায় নিচে যমুনার মধ্যেও ঝড় খেলাম। যমুনার খরস্রোত, বৈশাখী ঝড়, ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করে দিলো। আমাদের রাত্রে থানায় নিমন্ত্রণ ছিলো। স্বামী উপরে উঠে গেলেন। দারোগার বাসায় মেয়ে-ছেলে ছিলো না বলে আমার ওপরে ওঠা হলো না।

পরদিন সকালবেলা সাহেবখালি ফরেস্ট আপিসে পৌঁছলাম। সেখানে যে বাবু ছিলেন তাঁর নাম ভূপালচন্দ্র মিত্র। বাড়ি খুলনা জেলায়। ওঁর স্ত্রী আমার মামার বাড়ির গাঁয়ের মেয়ে। কাজেই মাসিমা হন। আমাকে দেখে খুশিই হলেন। অবশ্য মাসিমাকে দেখিনি কোনোদিন। মেশোমশাই গিয়েছিলেন বসিরহাট, কাঠ চুরি, কি মধু চুরির মোকদ্দমা করতে।

কাজেই মাসিমাদের বদলী হয়ে যেতে দেরি হবে।

এক সপ্তাহ কাটিয়েছিলাম মাসিমার একান্ত স্নেহ-মমতার, আদরের মধ্যে। মাসিমা গ্রামোফোন বাজিয়ে শোনাতেন আমাকে। ওঁদের অনেক গ্রামোফোন রেকর্ড ছিলো। আর ছিলো তার সব ক্যাটলগের বই। নরীসুন্দরী, তারাসুন্দরী, অমরেন্দ্রনাথ দত্তর অভিনয়, কত সব গান শুনতাম।

কয়েক দিন পরে চলে গেলেন ওঁরা।

আমার আবার এক নতুন অভিভাবক এলো। নাম বিপিন। রোগা বুড়ো ভালো মানুষটি। বাড়ি খুলনা জেলায় নন্দনপুর গ্রামে।

সাহেবখালি ফরেস্ট আপিস রায়মঙ্গল নদীর ওপর। রায়-মঙ্গল বিস্তারে খুব বড় না হলেও বন্য ও স্রোতবান। আপিসের কোণ ঘেঁষে একটি ছোটো খালও চলে গেছে। তার ওপরে রমাপুর ছোটো হাট।

জমিদারের কাছারি বাড়ি, হাটের স্যাকরার দোকানের ঠুক-ঠুক,

লোহার দোকানের ঠন-ঠন আওয়াজ নিরলস বৈশাখী দুপুরকে সজাগ করে দেয়।

এখানের আপিসও ইঁটের গাঁথা, তক্তার পাটলাজ করা। নদীর ধার দিয়ে ছোটো-ছোটো বন্য গাছ। আপিসের প্রাঙ্গণে বড়-বড় কেওড়া গাছ। সুঁদুর-পশুর গাছও আছে। পরিচ্ছন্ন উঠোনে গাছগুলো বড় সুন্দর দেখায়। বাবুই, বনটিয়ে, গাং-শালিকরা বাসা বেঁধেছে গাছের ওপর। পাখিদের কিচির-মিচির, ভোমরার গুনগুন, কেওড়া-ফুলের গন্ধ সুমধুর পরিবেশ রচনা করে সকাল সন্ধ্যায়।

আপিস-প্রাঙ্গণের একপাশে একটি 'বনবিবির থান' আছে। সেখানে পুজো দিয়ে বাওয়ালীরা কাঠ কাটতে যায়। পুজোরী তারা নিজেই। বাতাসার ভোগ খায় কিন্তু অনেকেই।

বন এখান থেকে দূরে। শীতকালের রাত্রে বাঘ আসে সেখান থেকে। গোরু, ছাগল, মানুষ যা পায় নিয়ে যায়।

এখানে মাঠ নেই। ফাঁকা জায়গায় ছোটো-ছোটো ঝোপ-ঝোপ গাছ আর মানুষের বাড়ি। আপিস থেকে মানুষের বাড়ি অনেক দূরে হ'লেও দেখা যায়। ওখানে আপিসের একটি গোল মিষ্টি জলের পুকুর আছে। ওর জল মিষ্টি হলেও খাওয়া যায় না। শুধু রান্না আর চান করা চলে। আমি যেখানে থাকি সেই বাড়ির মধ্যে আছে একটি নিম ও একটি তেঁতুল গাছ।

আর প্রচুর পুণর্ণবা শাক।

এখানকার হাট হিঙ্গুলগঞ্জ। প্রচুর তরকারি কাপড়-চোপড় সবই পাওয়া যায়। বনদেশ হলেও কলকাতার হাওয়া আছে এখানে। সবকিছু যেন কেমন-কেমন লাগে।

এখানকার মানুষেরা কথা বলে বেশ একটু অন্য রকম। অধিবাসী সবই তপসিলী শ্রেণীর।

মাসিমা আমায় বারণ করে দিয়েছিলেন, কোন্ সন্ধি বুড়ীর

সঙ্গে মিশতে। ওই বুড়ী নাকি জিনিস-পত্র সব ফাঁকি দিয়ে নেবে।

আজও পর্যন্ত সন্ধি বুড়ীর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হওয়ার একটা অদম্য কৌতূহল পোষণ করি মনে-মনে।

গ্রামের সব লোকের খবর সংগ্রহ করি আমার দুধওয়ালী নিবারণের মায়ের কাছে। নিবারণ এর একমাত্র ছেলে। সাবিত্রী পুত্রবধূ।

দেড়শো গরু আছে। প্রচুর দুধ হয়। দুধই এদের জীবিকা। প্রতি লোকেরই নাকি এক-শো দু-শো করে গরু আছে। সকালবেলা গরু ছেড়ে দেয়। সারাদিন জোলো আবাদি ঘাস খায়। সন্ধ্যার সাঁজাল দিয়ে গোয়ালে তোলে। গরুর জন্য একটি পয়সা খরচ নেই। গরুগুলি সব সময় জলে থাকে। জলের ঘাস খায়—সেইজন্য ওদের পায়ে লালচে দাগ। গলার ভেতর সব সময় ঘড়ঘড় করে।

নিবারণের মা রোজ দুপুরে দুধ দিতে এসে খুব গল্প করে। আর যাবার বেলা দুধের ঘটি ভরে মধু নিয়ে যায়। কালো-কালো মেঠে ভরা মধু থাকে রান্নাঘরের ভিতর।

জৈষ্ঠ্য মাস পড়ে গেছে। অনেক মধুর নৌকা উঠে আসছে বন থেকে। মধুর বাওয়ালীরা তিন-চার মাসের জন্য 'পাস' করে বনে যায়। যেখানে থাকুক আষাঢ় মাসে জল পড়ার আগে ফিরে আসে। চাল, ডাল, নুন, তেল, আলু, বড় বড় পাকা মিষ্টি কুমড়ো, ছাঁচি কুমড়ো আর একগাছি জাল নিয়ে ওরা বনে ঢোকে। জাল দিয়ে মাছ মেরে খায়। ফাগুন থেকে বৈশাখ পর্যন্ত ভালো মধুই পাওয়া যায়। তারপর গেঁও গরানের মধু লালচে ও তিক্ত স্বাদ হয়। এখানে সাতশো মন নৌকা পাস হয়। সাধারণ কাঠের,

গোলপাতার নৌকা মেপে হাম্বার দিয়ে,—মানে গভর্ণমেণ্টের 'শীল' মেরে চাপরাসীরা ছেড়ে দেয়। চাপসীরাকে ফরেস্ট গার্ড বলে। আর বাবু পাস দেন।

মধুর জালা মাপতে হয়। জালায় নৌকার ওজনে কি জানি কি ক'রে ওরা মণ হিসেব করে।

মধুর নৌকা অনেক সময় খুব বেশি পরিমাণ মধু পায়। তার বাড়তি দাম দিয়ে 'পাস' সই করে যায়। অবশ্য কম মধু পেলে দাম ফেরত পায় না। মধু পাওয়া না পাওয়া ভাগ্য মাত্র।

তারপর কাঠের নৌকায় চেয়ে মধুর নৌকার বিপদ বেশি। মধু ভাঙতে হয় উপরের দিকে চেয়ে-চেয়ে। এদিক দিয়ে বাঘমশাই দিব্যি তুলে নিয়ে চম্পট দেন।

তারপর অন্য লোকেরা যে লোকটাকে বাঘে নেয় তার হাতের কিছু নিদর্শন নিয়ে আপিসে ফিরে এসে কান্না-কাটি করে বাড়ি যায়। হয়তো একখানা কুড়ুল, নয়তো একখানা দা, নয়তো একটুকরো পরনের—যদি দেহের অবশিষ্ট কিছু থাকে তাও,—এই নিদর্শন না হলে বাড়ির লোকেরা বিশ্বাস করে না। আরো জানি কি কি কাজে দরকার হয় ওসব। চার-পাঁচজনের এই দারুণ—'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হলো সাহেবখালিতে।

মধুর বাওয়ালীদের বলে মৌলেরা। ওরা যখন মধু ভাঙতে যায় বাড়ির মেয়েদের যা যা কাণ্ড! সারারাত তারা রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়া খুব করে। দিনের বেলা রান্না করে না। পরিচ্ছন্ন, শুদ্ধভাবে থাকে। প্রতিদিন বনবিবির পুজো করে। যত দিন মৌলেরা বন থেকে না-ফেরে কোন দিন ওরা দিনের বেলা আগুন জ্বালবে না। আগুনের ধোঁয়ায় নাকি বনে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা যায়।

তারপর তো তেলাকুচা চুষিকাঠির মালা, বরণ কুলো মাথায় নিয়ে ডিঙা বরণ করে তোলে।

আবার কারও ভাগ্যে বাঘমশায়ের সেই ভয়াবহ প্রসাদ, মধুরেণ সমাপয়েৎ! কিছু নিদর্শন, বাঘে চিবোনো দু'একখানা হাত পাও মেলে। বাড়ির লোকের সঙ্গীদের কী কান্না!

পাস সই করে যাওয়ার সময় এক-এক টিন মধু দিয়ে যায়। আপিসে জালা ভরা কত মধু। আর আমি মনের সাধে বিতরণ করি গ্রামের লোকদের।

গ্রামের মেয়েরা বেড়াতে আসে। কত গল্প করে। তাদের কাছে সন্ধিবুড়ীর গল্প শুনি। সে নাকি তার এক খুনে, ফেরারী বোনপোকে তেলাপোকা করে দিয়ে পুলিসের চোখে ধোঁকা দিয়েছিলো একবার।

ওদের কাছে শুনে সন্ধিবুড়ীকে দেখবার ব্যাকুল আগ্রহই হয়, কিন্তু দেখা হয়ে ওঠে না।

আর একজন 'বিবি'র গল্প শুনি ওদের কাছে। তার নাম 'উত্তম নস্করের বড় বউ'। দেখতে তাকে পরীর মতো। সেজে বেড়ায় বিবির মতন। সে ওদের সঙ্গে কথাই বলে না। দেমাকে মেশে না।

তার নামে অনেক কুৎসাই শুনলাম। এই আপিসের কোন বাবু জানি……কি সব কলঙ্ক, অপবাদ! তার স্বামী একজন চাষী লোক। আবার একটা সতিনও আছে। নিজের ছেলেপুলে নেই।

সতিনপোদের পরে নাকি ডাইনী মায়াও আছে খুব! আবার এইসব কাণ্ড সতিন স্বামীও জানে। বিবিটি নাকি কাউকে কেয়ারই করেন না। এই সব ব্যাপারের টাকা-পয়সার ভাগ সতিন স্বামীও নেয়! তাই সংসারে কোনো গণ্ডগোল নেই!

যত গণ্ডগোল বেধেছে পড়শীদের মধ্যে। তাদের ঘুম নেই।

আমার নেহাত সৌভাগ্য বলতে হয়, বিবিটি নিজেই একদিন এসে দেখা দিলেন।

সত্যি, চোখ ফেরানো যায় না!

কোলে একটি কালো বছর তু'য়েকের ছেলে, বয়স ত্রিশের কোঠায়। রংটি শ্যামলা তো নয়ই, গৌরও নয়—এমন রং দেখা যায় শুধু পাকা দাদখানি লালচে রঙা ধানের। সেই রঙের অনুপাতেই পরিচ্ছদ। চলাফেরা মানানসই। গায়ে জামা নেই। কোন গহনা নেই। হাতে খুব মোটা তুটো সাদা ধপধপে শাঁখা। সিঁথিতে টুকটুকে সিঁতুর। কপালে খুব বড় একটা সিঁতুরের ফোঁটা। পায়ে চওড়া আলতা পরা। পানের রসে ঠোঁটতুটি রাঙানো। পরনে চওড়া লালপাড় বনটিয়ে রঙের শাড়ী। দেহের গঠন একটু মোটা, একটু লম্বা। সুকোমল চোখ তুটি বর্ষার জলভরাক্রান্ত আকাশ। বিত্যুৎ হয়তো চমকায় কোনোদিন। তার চেয়ে ছলছলায়মান বাদলার আকাশ, ভেঙে-চুরে ঝরবার সম্ভাবনাই বেশি।

এই অপূর্ব রূপময়ীকে দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। মনে কোনো খারাপ কিছু ভাবতেই ইচ্ছা করে না। ওরা কেন অমন বলে!

আমায় দেখে বললে, মা ঠাকুরুন, ওদের কাছে তোমার কথা রোজ শুনি। কতই বলে,—বাবুর বৌ এমন, তেমন। রোজ ভাবি আসি আসি, কিন্তু আসাই হয় না। এ ছেলেটার জ্বালায় আমার একপাও যাবার উপায় নেই কোথাও। তুমি তো দেখি একটুখানি মেয়ে। তা মা ঠাকরুন, তোমার বাপ-মা আছে তো?

আমি মাথা নেড়ে সমর্থন জানাই। ছেলেটাকে লিচু আর মধু খেতে দিই।

কত গল্প করলো। স্বামীর গল্প, সতিনের গল্প। সতিন ওকে নিজের বড় বোনের মতো ভালোবাসে। ছেলেরা ওকে ভিন্ন জানেই না। ওর নিজের একটি মেয়ে হয়েছিলো। থাকলে আমার চেয়েও বড় হতো।

এই সব কথার মধ্যে বলেছিলো বড় করুণ, একান্ত ভালোবাসার

বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। যা এতদিন পত্রে পুষ্পে বিস্তারিত হয়ে এসেছিলো আমার কানে। রূপে স্নেহে, সারল্যে, মিষ্টি কথায়, হাসিতে দেবীর সঙ্গেই শুধু তুলনা করতে ইচ্ছা হয়েছিলো, সেদিন এই মেয়েটিকে। যেন হেমন্তের শিশির-ভেজা মা-লক্ষ্মী।

বিবিকে তো দেখলাম। এখন বাকি থাকলো 'সন্ধে' বুড়ীকে দেখা।

বিপিন বোটম্যান আমাকে 'মাগো' বলে ডাকে। নটবরটার মতো সকাল বিকেলে গুছিয়ে গাছিয়ে খেতে দেয় না। অনেক সময় নটবরের অভাবটা আমার মনে জাগে। চিঁড়ে বাতাসা গামলা ও কৌটো ভরা পড়ে থাকে। পোকা হয়। ঘি বোয়েমে পচে কটু হয়ে যায়। ঝুড়িতে আমগুলি পচে যায়।

সুরেন ঠাকুর আমাদের সঙ্গে এসেছে। তার বাড়িও এখানে, রতনপুরে। সুরেন ঠাকুর দুবেলা দু'থালা ভাত দিয়ে যায়, তাই যা খাই। স্বামী তো বাইরেই ওদের ওখানে খান। আর বিপিন আমার থালা ধোয়, কাপড় ধোয়। সন্ধ্যায় চৌকি দেয়, বারান্দায় বসে। নটবরের মতো ঘরে আসে না, তবে ও আমাকে আদর ক'রে হয়তো 'মাগো' ডেকে একটু দুধের সর আমার হাতে দেয়। হয়তো একখানা ঝুনো নারকেল এনে আমার হাতে দেয়। আমিও ছোটো মেয়েটির মতো আদরের জিনিসগুলো নিই।

পরশুরাম চাপরাসীর বাড়ি বালেশ্বর জেলা। জাতে হিন্দুস্থানী কি কিছু, তা জানিনে। কথা বলে কেমন-কেমন। একদিন একটা গাংশালিকের বাচ্চা কেওড়া গাছ থেকে পেড়ে পাঠিয়ে দিলো। রাগ যা হলো আমার! আমি কি এত ছোটমানুষ যে পাখির বাচ্চা পুষবো? তবুও বাচ্চাটাকে নিলাম।

পাখির বাচ্চাটাকে নিয়েই সময় কাটাই। দুধ, ফড়িং যা দিই, ও খুব খায়।

পিছনের কেওড়া গাছের বাবুইরা বাসায় খুব ডাকে ঃ ইকি-উকি, উকি ; কুছু ইকি উকি ; উকি, কুছু।

সেই সঙ্গে আমিও পাখির ভাষায় সুর মিলিয়ে বলি ঃ ইকি-উকি, উকি কুছু।

পাখিদের আনন্দ-গীতি, নদী-বন-প্রান্তরের সান্নিধ্যে দিয়েছিলো ধরা সেদিন উন্মুখ কৈশোর। কেওড়া গাছে বাবুই পাখিদের গ্রাম। ওদের কোঠাবাড়ির দরজা দিয়ে এবাড়ি-ওবাড়ি যায় ফুড়ুৎ করে উড়ে-উড়ে। বেশ মজা লাগে দেখতে।

এদিকে আমার শালিকটাকে মোটা করবো ব'লে ঘাসের মধ্যে থেকে ফড়িং ধরে খাওয়াই।

সাহেবখালির বাড়ির মধ্যে পুনর্ণবা ঝোপ, ও ঘাসের মধ্যে সাপের আড্ডা। হলদে-বোড়া, তেঁতুলে-বোড়া ছিট্‌কে-ছিট্‌কে আসে ফড়িং ধরতে গেলে। তেঁতুলে-বোড়ার কাঁচা তেঁতুলের মতো রং। এক বিঘত লম্বা। দুই মুখ এক সঙ্গে করে তিড়িং করে লাফ দিয়ে পড়ে। বড় বিপজ্জনক বস্তু। খুব বিষাক্ত।

সারাদিন ফড়িং ধরে পাখিটাকে খাওয়াই। আমি যত ওর গালে ফড়িং দিই ও রাক্ষসের মতো হাঁ-হাঁ করে গেলে।

একদিন গেলো ওর পেট ফুলে। ভয়ে কেঁদে বাঁচিনে। আপিসের বোটম্যান চাপরাসীরা নানা রকম ওষুধ-বিসুধ করতে লাগলো হুলুস্থুল পড়ে গেলো।

অবশ্য ওষুধে কিছুই হলো না। একটু জীবন থাকতে ওরা আমার কাছ থেকে আপিসে নিয়ে গেলো পাখিটাকে।

ওরা সবাই বলে, সেরে যাবে, বেঁচে আছে।

ভাবি সত্যি !

কিছুদিন পরে যখন বুঝলাম, একেবারে সেরে গেছে, তখন কেঁদে-কেঁটে খাওয়া-নাওয়া ছেড়ে দিলাম।

স্বামী যেতেন পেট্রোলে কৈখালি ও রামপুরো ফরেস্ট আপিসে। কৈখালি অনেক দূর। রামপুরো সন্দেশখালি থানার নিকটে।

সেখান থেকে এক জোড়া বেড়ালের বাচ্চা এনে দিলেন। আমি আবার কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে সংসারী হলাম।

জৈষ্ঠ্য মাসে আম পেতাম খুব, আর জামরুল। কেওড়া খুব টক বন্য ফল, আর কাঁচা তেঁতুল দিন-রাত নুন দিয়ে সদ্‌ব্যবহার করতাম। আবার বিপিন কামরাঙাও এনে দিয়েছিলো হিঙ্গুলগঞ্জ থেকে। তাতে দিয়েছিলো নিবারণের মা কাঁচালঙ্কা, একেবারে সোনায় সোহাগা!

আষাঢ় এলো। বৃষ্টি নামলো। বাড়ির মধ্যের নোনা জলের পুকুরটা দিয়ে উজুসে মাছ উঠে ছড়িয়ে পড়লো খইয়ের মতো বাড়ির মধ্যের উঠোনে।

জলে ভিজে ধরতে গেলাম। দুষ্টু মাছগুলো ছিটকে-ছিটকে পালিয়ে গেলো স্নান করবার নালাটা দিয়ে পিছনের জলায়। ডিম-ভরা কুলকে টেংরাই ছিলো বেশি। ওরা কাঁটা ফুটিয়ে আমার হাত দু'খানা রক্তাক্ত করে দিয়ে পালিয়ে গেলো।

মাছ ধরেছিলাম মাত্র দুটো-তিনটে। বদনাটায় জল দিয়ে রেখে দিলাম।

সকালেবেলা পুষির বাচ্চাদের নিয়ে মাছদের সঙ্গে খেলতাম। মাছেরা যতো নড়তো পুষিরা ততো থাবা দিতো। বেশ খেলতাম আমরা তিন জনে।

বুড়ীগোয়ালনী থেকে নটবর মাঝে-মাঝে আমায় চিঠি দেয়। ওর পরিপাটি আন্তরিক স্নেহ-যত্নটুকু ফিরে পেতে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

বিপিন সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় বসে মাছ কাটতো। নতুন বর্ষায় মাছ পড়তে শুরু করেছে। রেখা, রুচো, দাঁতনে, ভাঙান, কাল-ভোমরা, পানখাওয়া, পারসে, তপসে, কুচো চিংড়িও প্রচুর।

হিঙ্গুলগঞ্জের হাটে বর্ষার তরি-তরকারিও উঠেছে যথেষ্ট। লাল টুক-টুকে বড় মিঠে কুমড়ো, বড় বড় ছাঁচি কুমড়ো, এক বিঘত লম্বা পটল, বড় বড় সতেজ কুশি, চিচিং আর খুব মোটা মোটা ওলের ডাঁটা। কুচোচিংড়ির সঙ্গে চমৎকার রান্না করতো সুরেন ঠাকুর।

এক-একদিন বিপিন বারান্দায় মাদুর বালিশ নিয়ে সারারাত আমার পাহারাদারী করতো। স্বামী যেতেন আতাপুর-মণিপুর কাছারিতে। দাবা খেলার নেশা ছিলো ওঁর খুব। খেয়ে-দেয়ে দাবা খেলে আসতে অনেক রাত হয়ে যেতো। তারপর তো গোন-বেগোনের রাস্তা।

বিপিন ঘুমোতো না। ঠায় বসে থাকতো। আমারও ভয়ে ঘুম আসতো না।

নায়েবমশাইরা বেশ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন বলতে হয়। রজনী-গন্ধা ফুলের তোড়া, ক্ষীরের পান্তুয়া পাঠাতেন হাঁড়ি ভরে। ফুলের সৌগন্ধে, ওদের উপর যত রাগ, সব জল হয়ে যেতো।

শ্রাবণ এলো। বেড়াল ছানা দু'টি আমার বেশ বশীভূত হয়ে গেছে। সব সময় আমার পেছন-পেছন বেড়ায়।

একদিন ওদের বড্ড অসুখ করলো। মাথা ঘুরে পড়ে যেতে লাগলো। আমি কেঁদে-কেটে অস্থির হয়ে উঠলাম। বেড়াল চিকিৎসার জন্য আপিসের বোটম্যানেরা সন্ধিবুড়ীকে আনতে বললো। ও নাকি নানা রকম মন্ত্র-তন্ত্র, তুক্-তাক্ জানে। সে নাকি সব জায়গায় যায় না। তবে আপিসে ডাকলে না এসে পারবে না।

সন্ধিবুড়ীকে দেখবার সাধ এতদিনে পূর্ণ হলো। সন্ধিবুড়ী এলো খবর পেয়ে।

বয়স ষাটের উর্ধ্বে। খানিকটা লম্বা, রোগা। মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা। কিছু পাকা কিছু কাঁচা। গালেও দু'চারটে

দাঁত নেই। পরনে থান কাপড়। বাঁ হাতে ছোট্ট একটি হুঁকো-কলকে। আমায় দেখে বললো, হ্যাঁগা মেয়ে, তোমার বেড়ালের বাচ্চার কি হয়েছে, গা ?

এরা হ্যাগা-ওগো ব'লে কথা বলে। কথাগুলি কেমন টান টান। অনেকক্ষণ-ধরে বেড়ালদের দেখে বললো, তুমি ভয় কোরোনি বাছা, এ এক্ষুনি ভালো হয়ে যাবেনি। একটু তেঁতুল ভিজিয়ে দাও। আমি একটু তামাক টেনে নিই।

ছোটো জল-শূন্য হুঁকোয় এরা তামাক খায়। সব মেয়েদের একটা-একটা হুঁকো আছে। নিবারণের মায়ের পুত্রবধূ সাবিত্রীও তামাক খায়, শাশুড়ীকে সমীহ ক'রে গোপনে। এদের দেশের মেয়েদের নেশা এই তামাক খাওয়া।

সন্ধি ওরফে সন্ধেবুড়ী তামাক খেতে-খেতে বললে, পাখাটা পাতছিলাম, তখন আপিসের নোকেরা ডাকলো, তাই আর তামাক খেতে পারিনি। 'পাখা' মানে 'উনুন'।

ওর চোখের দিকে নজর পড়তে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। পটলের মতো দুটো টানা গভীর কালো চোখ। চোখ দু'টির ঔজ্জ্বল্যে সত্যিই মনে ভীতি আসে। চোখ দু'টি যেন মনটা সব প'ড়ে নিচ্ছে। এমন চোখ তো দেখিনি কোনোকালে। উঃ, কী প্রখর সেই দৃষ্টি।

সেদিন ডাইনী মনে করে ভয়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। আসলে ঐ বুদ্ধি-গভীর চোখ দুটিই সব, মন্ত্র-তন্ত্র তুক্-তাক্ বনবাসিনীর মিছে।

তামাক খেয়ে তেঁতুল-চিনির শরবত করে বাচ্চা দু'টিকে জলো ঝিনুকে করে খাওয়ালো। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলো। খানিক পরে বেড়াল দু'টি বমি করে দিলো। আবার তেঁতুল গোলা খাওয়ায়, জলের ঝাপ্‌টা দেয়। এমনি করতে বেড়াল

ছু'টির বিহ্বলতা কেটে গেলো। তারপর গরম দুধ খাওয়াতে লাগলো। বাচ্চা দু'টি বেশ সুস্থ হয়ে উঠলো।

বেশ বেলা হয়ে উঠলো। সন্ধেবুড়ী বিপিনকে বললে, ঠাকুরকে আমার ভাত আন্না করতে বলে দাও। এখন বাড়িতে যেয়ে সন্ধে পুজো করে ভাত আন্না করে খাবো কখন? আমি লঙ্কা খাইনে, বাপু। সেদ্ধ, ভাজা, দুধ দিয়েই খাই। তোমাদের তো মাছের অভাব নেই। মাছ ভাজা, দুধ হলেই হবে। হ্যাঁগা মেয়ে, তোমার দুধ দেয় কে?

আমি বললাম, নিবারণের মা বিন্দিবুড়ী। সন্ধি বিরক্তির সুরে বললে, তোমাকেও বাগিয়েছে দেখছি।

আমি জানতে চাইলাম, বিন্দিকে জানে কি করে? বললে, আমার মায়ের পেটের বোন যে।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বিন্দি ওর কত নিন্দা ও গল্প করেছে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কোনোদিন বলেনি তার বোন হয়। জানিনা কি রহস্য এদের।

দুপুরবেলা পারসে মাছ ভাজা, ঘি, মধু, দিয়ে ভাত খেলো সন্ধি। বড় পরিচ্ছন্ন খাওয়াটি ওর। দেখতেও বেশ-বাস এদের মধ্যে পরিচ্ছন্ন। আমাকে বললে যদি বাড়তি দুধের দরকার হয় ওর কাছ থেকে যেন নেওয়া হয়।

এখানে এক আনা এক সের দুধ। আমি, কটা গোরু আছে জানতে চাইলাম। বললে, কটাইবা হবে, মাত্র গোটা ত্রিশেক। ওতেই কোনো রকমে তার একটা মানুষের চলে যায়।

খেয়ে দেয়ে তামাক খেয়ে বেড়ালদের আবার দুধ খাইয়ে সুস্থ করে দিয়ে একটা টাকা, একখানা নতুন থান কাপড় এক ঘটি মধু নিয়ে বুড়ী চলে গেলো।

বলে গেলো দরকার হলে আবার আসবে।

শ্রাবণের বৃষ্টি, আর-বুনো মশা জ্বালাতন করে তুললো। বিকেল থেকে মশারা গান গেয়ে ঘরে ঢুকতে শুরু করে। সারা রাত ভজন গানে মোহিত করে ভোরবেলা বাড়ি ফেরে। একি আর আমাদের দেশের দু'চারজন মশকবাবু। হাজারে, লাখে এঁদের আবির্ভাব হয়।

হিঙ্গুলগঞ্জের হাট থেকে বাতাবী লেবু ও খুব বড় বড় হাঁড়ির মতো ওল আনে। তাতে একটুও গলা ধরে না। মাছও পড়ছে যথেষ্ট পরিমাণে।

নিবারণের মা বিন্দিবুড়ী খুব মিষ্টভাষী মানুষ। ওর সঙ্গে বেশ গল্প জমে। দুপুরে দুধ দিতে এলে ওকে সন্ধিবুড়ীর কথা ব'লে অভিযোগ করলাম।

ও উত্তর দিলে, বোন হয়ে বোনের কাজ যখন করে না, তখন বোন বলে পরিচয় দিতে হবে কি জন্য ?

জানিনা কি বোনের কাজ। আর ঝগড়ার হেতুটাই বা কী।

এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটে গেলো একদিন। সকাল তখন আটটা-নটা হবে। আপিসের বারান্দায় কে নেচে নেচে গান করছে মেয়ে গলায়। আমি ছুটে গেলাম দরজার ধারে দেখতে।

দেখলাম কে একজন সুন্দরী মেয়ে চেলীর কাপড় পরে নাচ-গান করছে। স্বামী প্রশংসা-মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন। আমার কিন্তু বড়ো হিংসা হয়েছিলো সেদিন। আজ মনে পড়লে হাসি পায়। শেষ পর্যন্ত বেহায়া মেয়েটি স্বামীর সঙ্গে আপিসের মধ্যে বসে অনেকক্ষণ গল্প করলো। সিগারেট পর্যন্ত খেতে কুণ্ঠিত হলো না। মেয়েটির সারাগায়ে বন-ফুলের গয়না। মাথায় ফুলের সিঁথি। হাতে এক থালা ফুল। গানও গাইছিল ফুলের।

মেয়েটি অনেক বেলায় চলে গেলো। ব্যাপারটা আমার চোখে মোটে ভালো লাগলো না।

সন্ধ্যেবেলা বিপিনের কাছে শুনলাম সাত জন্মেও মেয়ে নয়! ও একজন বহুরূপী ছেলে। মালিনী সেজে নাচ-গান করে টাকা নিয়ে গেলো। ওর সুরমা-টানা কালো চোখ, দীর্ঘ লম্বা বেণী, মেয়ে-গলা আমাকে বেশ জব্দ করেছিলো কিন্তু!

কাণ্ডের পরে কাণ্ড, নিত্য নতুন কাণ্ড ঘটছে আপিসে। আজও এক কাণ্ড ঘটলো ঠিক সন্ধ্যেবেলাটায়। আপিসের পিছনের দিকে খালের ধারে অনেকগুলো বড়ো চোরাই নৌকা তোলা ছিলো উপরে। তার মধ্যে অনেক ভালো-ভালো দামী কাঠ ছিলো। এই নৌকাগুলি বিনা 'পাসে' বে-আইনী কাঠ কাটার জন্য আটক করে রেখেছে। এখনও মামলা চলছে।

হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা 'চোর-চোর', 'ধর-ধর'!

বেপারী নৌকা থেকে দুজন চোর ধরে আনলো। তাদের বেঁধে রেখে দিলো আপিসের বারান্দায়। চোরেরা খুব কাঁদা-কাটা করতে লাগলো। সারা রাত ওইভাবে কাটলো।

ভোরবেলা আর এক নতুন কাণ্ড ঘটলো। যেমন দরজা খুলে বের হতে যাচ্ছি সন্ধি-বিন্দি, দুই বোন ও নিবারণের বউ সাবিত্রী দরজায় 'হত্যা' দিয়ে বসে ছিলো—আমায় দেখে হাউ-মাউ করে কেঁদে তিনজনেই আমার পা জড়িয়ে ধরলো।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম এই আশ্চর্য কাণ্ড দেখে। কী এমন ব্যাপার হলো, যার জন্য চির শত্রু দুই বোনে মিলন হয়ে গেলো?

দুই বোনে শুধু বললো, মাপ করো, মাঠাকরুণ, না-বুঝে করে ফেলেছে, বাবুকে বলে ওদের ছাড়িয়ে দাও।

বুঝলাম, চোরদের ছেড়ে দিতে বলছে। আশ্চর্য! চোরদের সঙ্গে সম্বন্ধ কী এদের?

আমি বললাম, ওরা অন্যায় করেছে, ছেড়ে দিতে বললে আমার কথা শুনবে কেন?

নিবারণের মা বললে, ওই তো আমার নিবারণ আর আমার ভাই বুধলাল।

এইবার বুঝলাম এদের মিলনের কারণ।

গঙ্গা-যমুনা মিশে গেছে ভাতৃস্নেহ-সমুদ্রে।

আমার অনুরোধে চোর ছাড়া হলো। যদিও, কিছু কিছু দক্ষিণা না-নিয়ে ছাড়লো না বোটম্যানেরা। দক্ষিণার তালিকা—দু' সের ঘি, দুটো পাঁঠা, আর দশটা টাকা।

পাঁঠা-ঘিতে ওদের বিশেষ বাধে না। ঠেকা লাগে নগদ টাকায়।

সাহেবখালিতে পদ্মরাজ বলে একটি গ্রামের লোক আপিসে সব সময় থাকতো। ও আপিসের টুকিটাকি কাজ করতো। টুকিটাকি কাজ নৌকা, মধুর জালা মাপা। অভিপ্রায়, পরিণামে কাজ শিখতে পারলে ফরেস্ট গার্ড হতে পারে। ছেলেটি বড়ো বিনয়ী ভালো ছেলে। অলক্ষ্যে আমার তত্ত্বাবধান করতো।

একদিন তার বিয়ে হলো। প্রথমেই বৌ এলো ফরেস্ট আপিসে আমার কাছে। বৌ বরণ করে টাকা দিয়ে মুখ দেখলাম।

এটা এখানকার রীতি। ফরেস্ট অফিসারকে এরা খুব খাতির ও সম্মান করে। কোনো বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ হলে চাল-ডাল, মাছ-পাঁঠা, ঘি-দৈ ভেট পাঠায়। এরা জমিদারের প্রজা হলেও আপিসে আসে বিবাদ বিসম্বাদের বিচার করাতে।

সাহেবখালির নদী রায়মঙ্গল উচ্ছ্বসিত হয়ে ফুলে উঠলো বর্ষায়। একে তো বন্যা, স্রোতোবান, তায় বর্ষার ইন্ধন। বর্ষায় বন্য গাছগুলি ঘনায়মান হয়ে উঠলো, মশার বংশ বৃদ্ধি হলোও যথেষ্ট।

বৃষ্টির জলে গ্রামের মেয়েরা আর আসে না। সম্বল মাত্র বোটের পেট্রোল অফিসার হরিদাসবাবুর বৌ। তিনি মাঝে মাঝে আসেন। আমিও মাঝে মাঝে যাই তাঁর বোটে।

মনটা ম্রিয়মাণ, উত্ত্যক্ত হয়ে উঠলো।

আমার অন্তর্বেদনার আবেদন, একদিন সত্যিই পৌঁছালো ভগবান রাজার দরবারে। অভাবিতভাবে হঠাৎ স্বামী বদলী হলেন কপোতাক্ষী ফরেস্ট আপিসে। সেই বুড়ীগোয়ালনী আপিসের নিকটে কপোতাক্ষী আপিস। নটবরের সঙ্গে দেখা হবে। মনটা বেশ খুশিই হলো। আর খুশির পরে খুশি হলাম—কপোতাক্ষী খুলনা জেলায়—দেশে যাওয়ার আশা পত্রপুষ্পে গজিয়ে উঠলো মনে।

একদিন যিনি সাহেবখালিতে বদলী হয়ে আসবেন, তিনি এলেন। নাম হীরালালবাবু। ওঁর মেয়ে আমার একটি পুষিকে চেয়ে নিলো।

শ্রাবণ সন্ধ্যায় বিষণ্ন মনে রওনা হলাম কপোতাক্ষীর উদ্দেশ্যে।

কপোতাক্ষী

কপোতাক্ষী ফরেস্ট আপিসে পৌঁছানো গেলো। সঙ্গে এলো সুরেন ঠাকুরের ছোট ভাই রাজা ঠাকুর। ও তেমন ভালো রান্না করে না। কিন্তু বড় সুবাধ্য ছেলেটি। একেবারে সুবোধ—যা পায়, তাই পরে; যা পায়, তাই খায়। যা বলি, তাই শোনে।

আমার পুষিরানী এখন বেশ বড় ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। তার গলায় লাল-নীল পশমের চেন তৈরি করে পরিয়ে দিলাম।

কপোতাক্ষীকে বলে কবতক্ষ। এখানে দু'জন বাবু। স্বামী যাঁর জায়গায় এলেন তিনি বদলী হয়ে চলে গেলেন পরদিন।

এখানেও এক নিবারণের মাকে পেলাম। বড় গরীব। ভালো মানুষ। নিবারণের মাকে আমি এটা-সেটা দিতাম। ও তার বিনিময়ে বড়-বড় কাঁকড়া মাছ ধরে দিয়ে যেতো। ওর সঙ্গে অনেক সময় গল্প করতাম। ও এলেই না-খাইয়ে ছেড়ে দিতাম না।

কবতক্ষ জায়গাটা বড়ো নিচু। শুধু জলা। ধান-টান তেমন হয় না। আপিসটি নদীর ধারে টিলার মতো উঁচু জায়গায়। নিচে কবতক্ষ নদীর গোড়া। তাই আপিসের নাম কবতক্ষ।

আপিসের নিকটে কোনো ঘর নেই। কবতক্ষ বলে একটা গ্রাম আছে। সে বেশ খানিকটা দূরে। সেখান থেকেই আসতো নিবারণের মা ভেড়ি বেয়ে-বেয়ে।

এরও একটি মাত্র ছেলে নিবারণ। পুত্রবধূও আছে। সাহেব-খালির নিবারণের মায়ের চেয়ে এখানকার অভাবী নিবারণের মাকে বেশি ভালো লাগতো।

দূরে উঁচু করে পাড়-বাঁধা আপিসের গোল-পুকুর। ওর জল

মিষ্টি। রান্না-খাওয়া চলতো। আপিস-প্রাঙ্গণে কলমীলতা সুষনি-শাক, নাল-ফুল, সাপলা-ভরা স্বচ্ছ কালো জলের পুকুরটিতে শুধু স্নান করতো সবাই।

নদীর ধার দিয়ে সেই ভেড়ি। তার নিচে সরু বন্য গাছের শ্রেণী। গাছের ফাঁক দিয়ে চলায়মান জল মৃদু, সুস্নিগ্ধ সান্ধ্য বাতাসের দোলা লেগে ছড়িয়ে পড়তো দূর হতে দূরে।

ছোট্ট বন্য পাখির ঝাঁক কিচির-কিচির করে উড়ে ঘুরে পড়তো ওড়া-কেওড়ার ডালে। নদীর ওপার থেকে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া বনের মাথায় স্বপ্নময়ী হয়ে নামতো। এপারে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে উঠতো

টুপনি কৈ-রা খেলতো—সৈ, সৈ, টুপ্-টুপ্, খুপ্-খুপ্।

কবতক্ষ আপিসের গোল-পুকুর পাড়ে বিলের মধ্যে একটা উঁচু টিলার ওপর ছিলো একটা সাদা রঙের লোহার মানুষ। ওই মানুষ-টিকে দেখে নাকি স্টীমারগুলি দিক নির্ণয় করে।

গভীর রাত্রে বহুদূরে বনরেখার প্রান্তে স্টীমারের সার্চ-লাইট রহস্যময় হয়ে উঠতো। গোল আলোকটি যেন দেবতার জ্যোতির মতো বহুক্ষণ থাকতো আকাশের গায়ে। মনে হতো সুশ্যাম বন-কিশোর নামছেন যেন্ হরিণীর পিঠে চড়ে ; হাতে সবুজ পাতার বাঁশী, মাথায় বন-কেয়ার মুকুট।

স্টীমারগুলি নাকি যেতো আসাম, ডিব্রুগড়ে। নিস্তব্ধ রাত্রের আকাশে ছড়ানো রহস্য-গম্ভীর আলোক-রেখা এমনিই বহুবার দেখেছি বহু জায়গায়।

কবতক্ষ আপিসের বড়বাবু ছিলেন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কি তার খেতাব জানিনে। অনেক টাকা মাইনে পেতেন শুনতাম। আর টাকার যে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হ'তো, তাও দেখতাম।

ওঁর পরিবারের মধ্যে—স্বামী-স্ত্রী দু'জনে, বেড়াল গোটা আষ্টেক,

কুকুর দশ-বারোটা, রাজহাঁস দু'টো, চাকর দু'জন। পথের কুড়োনো ছেলে জন চারেক। ওঁর হরেকরকম পুত্র-কন্যারা সব সময় বাসাটি সরগরম ক'রে রাখতো।

ওঁর স্ত্রী ছিলেন বড় শুচিবায়ুগ্রস্তা মানুষ। বেড়াল, কুকুর, হাঁস, মানুষ ছেলে-মেয়ের জন্য সব সময় একজন চাকর গোবরজল, গঙ্গা জল ছড়া দিতো। প্রতি ছেলে-মেয়ের থালা-গেলাস বিছানা সব আলাদা। কুকুর-বেড়াল ছেলে-মেয়েরাও কাঁসার থালায় ভাত খায় মাছ-দুধ দিয়ে। প্রতি রবিবার ছেলে-মেয়েরা সাবান মেখে চান করে আর দৈ, মাংস, সন্দেশ, রসগোল্লার ভোজ খায়। আমার পুষিরানীকেও ওঁরা নিমন্ত্রণ করতেন রবিবারে।

কবতক্ষ ফরেস্ট আপিস সুন্দর বনের সবচেয়ে বড় আপিস। এখানে খুব বড় বড় নৌকা পাস হয়। কলকাতার অনেক হিন্দুস্থানী বাওয়ালী নৌকা পাস করতে আসতো। তারা বাবুদের ভালোবেসে খাবার দিয়ে যেতো। হাঁড়ি ভরা-ভরা বড় বাতাসা আর আট-ফাটা কাবুলী ছোলা ভাজা।

কবতক্ষ আপিসে ভাদ্র মাসে গলদাচিংড়ী, পাতাড়ি মাছও অনেক। বিলের জল উপ্‌চিয়ে ভেসে গেছে আমার বাড়ির মধ্যের পুব কোণটায়! সেখানে আবার বড়বাবুর রাজহাঁস দু'টি চান করে। সবুজ টিপ-শেওলার মধ্যে অনেক রকম ছোট্ট ছোট্ট মাছেরা টুপ্‌টুপ্‌ করে বেড়ায়। বেশ লাগে দেখতে।

বিলের জলে, স্বচ্ছ জলের তলার সব দেখা যায়। বাচ্চা পোনা নিয়ে লেঠা শোল মায়েরা ঘুরে বেড়ায়। কৈ-রা টুক্‌টুক্‌ করে উজোয় আর গোল গোল বেঁকি বেঁকি জল ছড়িয়ে যায়। শুঁদি কচ্ছপ, গুগ্‌লীরা জলের তলায় কেমন শুঁড় বার করে।

গোড়া ঝিনুকরা জলের মধ্যে অনেক আছে। নীল, লাল, শাদা, সাপলা ফুটেছে যথেষ্ট।

জলার কিনারে কলমী ঝোপেও নীল কলমী ফুল। খৈয়ের মতো ফুটে আছে শাদা ছোট্ট-ছোট্ট শালুক ফুলগুলি। জলাটা যেন রূপকথার মালঞ্চ বন। জলের তলায় কালো ফুটি-ফুটি দেওয়া ছোট্ট তিতপুঁটির ঝাঁক। রুপোলী চওড়া সরপুঁটিরাও কেমন ঘুমোয়।

সত্যিই শরতের ধরা-ভরা সুন্দরবন মানুষকে আকুল করে, মুগ্ধ করে তোলে। উচ্ছ্বসিত পূর্ণা কপোতাক্ষী, ওপারের পল্লবাকীর্ণ বনশ্রী অতিবড় রিক্ত মনকেও পূর্ণ করে দেয়। ভাদ্রের রৌদ্রে হীরকের মতো ঝিক-মিক করে জলস্রোত। রাত্রের জ্যোৎস্নায় মায়াময়ী হয়ে ওঠে রূপসী নদী। ভেড়ির নিচের বন্য গাছগুলির মাথায় জ্যোৎস্না পড়ে। মনে হয় জ্যোৎস্নাই যেন রাত্রির ফুল।

নদীর ধারে বন্য কেয়া ঝাড়ে শাদা-শাদা লম্বা ফুল ফুটেছে অনেক সুগন্ধ আসছে পুবের জালালাটা দিয়ে। পুবালী বাতাসটাই হয়ে উঠেছে কেতকীগন্ধ সুরভিত।

কিন্তু এবার আমার মনে কোনো বেদনা নেই। আমার পুষিরানী আমায় সব ভুলিয়ে রেখেছে!

কবতক্ষ স্টেশনে একদিন হঠাৎ বুড়ীগোয়ালন্নী থেকে নটবর এলো। ও যেন কেমন হয়ে গেছে। আগের মতো সুখী সদা-হাস্যময় মানুষটি আর নেই। কেমন ব্যস্ত-সমস্ত সন্ত্রস্ত ভাব। স্ত্রী পুত্র মারা গেছে ওর। যে বাবুর কাজ করে, তাঁর সঙ্গেই এসেছিলো; তিনি ডাকতেই তাড়াতাড়ি চলে গেলো।

নটবরকে তেমনি করে ফিরে পেলাম না। দুঃখ বিধ্বস্ত মানুষটির জন্য আজ মনটা কেমন হাহাকার করে উঠলো।

আমার পুষিটা বড় অবাধ্য নিমকহারাম হয়ে গেছে। ফাঁক পেলে বড়বাবুর বেড়াল ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলতে যায়। আর স্বামীর আপিসে যায়। ওঁর পায়ের তলায় বসে গুড়গুড় করে। উনি যেখানে যান, সেখানে যায়।

পুষিটাকে বোটম্যান চাপরাসীরা সাজায় বেশ। আপিসের দোয়াতের লাল কালি দিয়ে পায়ে আলতা পরিয়ে দেয়। সিঁথিতে সিঁদুর করে দেয়, গলায় রঙিন উলের চেনের মালা। ওকে দেখায়ও সুন্দর।

আশ্বিন মাসে আমার শ্বশুর এলেন। আমাকে নিয়ে যেতে। আমার পুষিকে দেখে ওঁর খুব পছন্দ হয়ে গেলো।

কবতক্ষের কাছে—নিবারণের মা—রাজাঠাকুরের কাছে বিদায় নিয়ে আবার যাত্রা করলাম বাড়ির উদ্দেশে।

বাড়ি পৌঁছলে বাবা-মা খুব খুশি হলেন। আর খুশি হলেন পুঁটি পিসিমা। উনি কলকাতায় ভাইয়ের বাসায় চলে যাবেন। আমাকে কতগুলি সুন্দর ওঁর হাতের তৈরি ছোট্ট বালিশ বিছানা ফুল তোলা কাঁথা দিয়ে গেলেন। মাকে বললেন, ওর খোকা হলে দিও, বৌদি।

আমার পুষিকে শ্বশুর নিয়ে গেলেন শ্বশুরবাড়িতে। মা বললেন, —এখন আমার কাছে পুষি থাকলে নাকি অকল্যাণ হবে। মন না চাইলেও দিয়ে দিতে হলো।

ওঁরা আদর করে পুষিরানীর নাম রাখলেন বিদেশিনী।

ঘটনা ঘটতে সময় লাগেই বা কতটুকু? কয়েক মাসের মধ্যেই পুঁটি পিসিমার মৃত্যু সংবাদ এলো কলকাতা থেকে। বড় কষ্ট হয়েছিলো ওঁর মৃত্যুতে। মায়ের মতো ভালবাসতেন। সুখ শান্তিহীনা বাল্য-বিধবা ছিলেন, একটি মাত্র পুত্রের জননী।

পঞ্চদশের কোঠায় পা দিতেই আমার একটি মেয়ে হয়ে মারা গেলো, পৌষ মাসের শীতে ঠাণ্ডা হয়ে। তখনকার দিনের আঁতুড়-ঘর, নারকোলপাতা তালপাতা ঘেরা—যাকে বলতো 'বাগলো'। কত শিশুই যে মারা যেতো আড়ষ্ট হয়ে অপূর্ব সূতিকাগৃহে!

অসুস্থ মন ও শরীর নিয়ে চৈত্র সন্ধ্যায় আবার রওনা হলাম সুন্দরবনের উদ্দেশে। সেই ধলাইতলার শ্মশানঘাটে আবার নৌকায় উঠলাম। আর সেই ঝাউ, উদাসী শ্মশান হাওয়া মর্মরিত ঝাউ আবার আমাকে বিদায় দিলো দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নদী, শ্মশান, চৈত্র সন্ধ্যা ঝাউয়ের দীর্ঘশ্বাসে বর্ণিত হয়েছিল সেদিন—শাঁ শাঁ শাঁ, শন্‌শন্।

কত নদী বন পেরিয়ে, চালনার হাট দিয়ে, কাতেনাঙলার কাছারি বাড়ির, গদাইপুরের পাশ দিয়ে, পশোর নদীর বাঁক ঘুরে পৌঁছে-গেলাম খড়মা নদীর পারে চিলে চাঁদপাই ফরেস্ট আপিসে।

খড়মা যেখানে বাঁক ফিরেছে—সেই তিন কোনা দ্বীপের মতো জায়গাটাই ফরেস্ট আপিস। আপিসের ঠিক ডাইনে দিয়ে খড়মার একটি ছোট্টো খাল চলে গেছে চাঁদপাই গ্রামের মধ্যে।

খড়মা নদীর ধারে ছোটো খালটার ওপারে চিলের কাছারি

বাড়ি। ব্যবধান মাত্র খালটুকুর। কাছারির ফরেস্ট আপিসের সঙ্গে খুব মেলামেশা। অবশ্য বাইনকাঠের ছোট্ট সাঁকো পারাপারের পথ। কাছারিটি দু'জন জমিদারের ; বাগেরহাটের মহেন্দ্র বিশ্বাস, ক্ষেত্রনাথ মিত্রের।

খড়মা এখন চৈত্র শেষে শীর্ণা। ওপারে মিশ্র পাতা ঝরা বন্য বৃক্ষশ্রেণী। অনেক দূর ধরে হেতাল বন। হেতাল গাছগুলি কিছুটা খেজুর, কিছুটা সুপারি গাছের মতো দেখতে। ফলও খেজুরের মতো দেখতে। মাথিও সুপারির মতো খাওয়া যায়। হেতালগাছগুলি দেখলে ভ্রম হয়,—মনে হয় যেন গ্রামের সুপারিবন। ওর পাশেই যেন খড়ের ছাওয়া বাঁশের কনচির বেড়া দেওয়া দত্ত বাড়ি, কামার বাড়ি।

এপারে আপিসটিতে তক্তার পাটলাজ, ইটের গাঁথনি করা। বাড়ির মধ্যের ঘর অন্য জায়গারই মতো।

আপিসটির চারদিকে বেশ সজ্জিত। সুন্দরভাবে ফল-ফুলের বাগানে ঘেরা। বেশির ভাগ আম, সুপুরি, নারকেল গাছ। নদীর দিকে, আম গাছগুলিতে ছোটো ছোটো আমের গুঁটি কচিপাতা নিয়ে নদীর মধ্যে ঝুঁকে আছে। নারকেল গাছগুলিও বাঁকা হয়ে গেছে নদীর মধ্যে।

বড় নারকেল গাছটায় আবার চিলে বাসা বেঁধেছে। দিন রাত চিলটা মাছের জন্য কাঁদে। ওর ছেলে-মেয়েগুলিও মায়ের সঙ্গে কুচ্‌কাচ করে চেঁচায়।

কাঁঠাল আর সুপারি গাছগুলি কাছারির দিকে খালের ধার দিয়ে। আপিসের উঠোনে পেয়ারা, প্রচুর বেলফুলের গাছ পুষ্প-সুন্দর হয়ে আছে। বনমল্লিকা, টগর, গুরোল চাঁপা, মাধবীলতাও থোকা থোকা ফুটে আছে খালের ধারের কাঁঠাল গাছটায়। আপিসের প্রাঙ্গণে বাম ধার দিয়ে অনেক ঔষধিলতা ও ফুলের গাছ।

শ্বেত বসন্ত, রক্ত বসন্ত বিশল্যকরণী স্বর্ণলতা, দশমা চণ্ডীফুলের গাছ,—এমনি কত কী।

আপিসের পিছনে বেল গাছ বোটম্যানদের রান্নাঘরের পাশে কাঠবাদম গাছ। চাপরাসী বোটম্যানদের ব্যারাকের পিছন দিয়ে কলাগাছ, লেবুগাছ, খেজুর গাছ।

আমার বাড়ির মধ্যের উঠোনেই শুধু এগারোটা পেয়ারা গাছ, কচি আমে ভরা দুটো আম গাছ, ঘরের পিছনে একটা বট গাছ।

এগুলি আমার নিজস্ব সম্পত্তি। পেয়ারা, কাঁচা আম আমার রাজভোগ। বটপাতা খেলবার বস্তু। বটের বাতাস ও ছায়া অতিবড়ো শুষ্ক, তপ্ত, মনকেও সুশীতল করে দেয়।

সামনে খড়মার ওপার দিয়ে বহুদূর চলে গেছে ছোটে ছোটো জ্বালানী কাঠের বন। এ বনে বাঘ, হরিণ থাকে না। বাঘ আছে সেই পাশের নদীর ধারে গভীর সুঁদুর পশুর বনে। সেখান থেকে ওরা মাঝে মাঝে খড়মার ধারের বন বেয়ে আসে চাঁদপাই গ্রামের মানুষদের সঙ্গে মোলাকাত করতে।

ফরেস্ট আপিসের পিছন দিয়ে দিগন্তহারা মাঠ। প্রান্তরও বলা যায়। কোথাও একটি ছোটো গাছ নেই। সব ধানের জমি। বহু দূরে দূরে স্তূপ-স্তূপ গ্রামের ঘর-বাড়ি দেখা যায়। আর দেখা যায় বাঁক-ফেরা নদীর রেখা।

আমাদের ডাইনে ছোটো খালটার ওপারে চিলের কাছারি বাড়ির পিছন দিয়ে খালের বাঁধটার ওপাশ দিয়ে কিছু মানুষের ঘর-বাড়ি আছে। বহুদূরের গ্রাম থেকে মানুষেরা আসে আমার ঘরের পিছনের ভেড়ি বেয়ে।

বুকে-পিঠে অরণ্য-প্রান্তর বেষ্টিত আপিসের এই মনোরম কুঞ্জটি। নিষ্পত্র বন-নদী-প্রান্তরের অপূর্ব সমাবেশ।

বসন্ত-অভিষিক্ত দক্ষিণা বাতাসের দোলা লাগে মাধবীলতার

থোকায়। কেবল গাছে না পিক্ কোকিল, দোয়েলের পাত্তা নেই এই বনদেশে।

কয়েকদিন থাকলাম। শরীরটা আরও খারাপ হতে লাগলো। নেহাত একা। মনটা ভালো লাগে না। শরীর দুর্বল। প্রায় সময় শুয়ে থাকি। দেখা-শোনা করে দেবেন বলে একটি ছেলে। মামাশ্বশুর ওকে পাঠিয়েছিলেন খুলনা থেকে। আমাদের দেশে ওর বাড়ি।

রামপাল থেকে স্বামী কিছু ওষুধ আনিয়ে দিয়েছেন। তাই খাই। ওই রামপালে আমাদের ডাক, জল, থানা।

চৈত্রশেষের নদী-প্রান্তরের বাতাসে মন কেমন করে। হাহাকার মেশানো যেন ওই বাতাসে। কিছু ভালো লাগে না। পেটে ব্যথা। মাথায় যন্ত্রণা।

একদিন সকালবেলা পুকুরঘাটে বটতলায় বসে দাঁতন করছি, পিছনের ভেড়ি-পথে ঝুন্-ঝুন্ মল্ বা তোড়ার শব্দ! মাঠ ভেঙে, ভেড়ি বেয়ে কেউ আসছে নাকি? শব্দ থেমে গেলো। মনে করলাম ভুল করেছি।

গ্রাম তো অনেক দূরে। কে আবার আসবে? ছাগল-গোরুর গলার ঘণ্টা হবে। মাঠে চরছে সকালবেলায়। আবার যেন মৃদু ঝুন-ঝুন। খুব নিকটে। দরজার কাছে।

দরজার দিকে চাইতেই এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেলো। সালঙ্কারা ছোট্ট দেবীপ্রতিমার মতো একখানা হাসিমাখা মুখ সরে গেলো।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এই বনদেশে সোনার গহনা পরা কে বাবা! তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম দেখতে। কোথাও কেউ নেই। অবাক্ হয়ে গেলাম।

দিগন্তহারা মাঠ শুধু ধু-ধু করছে। মাত্র গোরু-ছাগল চরছে দূরে। মানুষের চিহ্নও নেই। অসুস্থ, দুর্বল শরীরে কেমন ভয় হলো। বনবিবি নয়তো ?

আমার পনের বছরের যত বুদ্ধি আছে তা দিয়ে চিন্তা শুরু করলাম। কূল-কিনারা পেলাম না।

হঠাৎ আবার ঝুন্-ঝুন্। তার সঙ্গে খুট্-খুট্ চাপা হাসির শব্দ। এমনি হাসি আমি ছোড়দির সঙ্গে খুনসুড়ি করে হাসতাম ছোটো বেলায়। তাহ'লে মানুষ হবে নিশ্চয়ই।

আবার দরজার কাছে গেলাম। কেউ নেই। কোনো শব্দ নেই।

ফিরে এলাম।

এমনি হাসি শুনি, আর যাই। বার চারেক হলো আসা-যাওয়া।

মুখটা ধোয়াও হলো না। কোন্‌দিক থেকে যে হাসির শব্দ আসছে ঠিক বুঝতে পারছিনে। এদিকে ওদিকে বোকার মতো চেয়ে দেখছি। চাপা হাসির শব্দ ততো যেন বেড়ে চলেছে।

কি আপদেই পড়লাম। আমার তো বাড়ির বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। আমি একজন বাবুর বউ। তখন এগারো বছর বয়সে সুপতি আপিসে যা ইচ্ছা তাই করতাম। এখন তো আমার পনেরো বছর। কাজেই সংযত মনে চারিদিকে চাইছি।

হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার খুব নিকটে খালের ধারে ছোটো-ছোটো বন্যগাছের ঝোপের মধ্য দিয়ে ছোট্টো একখানা গহনা-পরা হাত। ছোট্টো স্বর্ণচাঁপার কলির মতো আঙুলগুলি।

অগ্রপশ্চাৎ দেখে মাঠের চারিদিকে চেয়ে ছুটে গিয়ে টেনে বের করলাম গয়না-পরা হাতখানি।

খিলখিল হাসিতে ফেটে পড়লো দেবীপ্রতিমা। টানতে টানতে নিয়ে এলাম বাড়ির মধ্যে।

হাসি আর থামে না। হাসিতে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আমার মুখের দিকে চেয়ে অমন করে হাসলে আমিই বা কতক্ষণ হাসি চাপতে পারি,—আমিও হাসতে শুরু করলাম।

কতক্ষণ যে হেসেছিলাম জানিনে, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে গেলো। হাঁপিয়ে গেছি।

হাসি থামালাম কার কথায়। কে বললো, তুরা যে তামান হাসি হেসে ফেললি। কাল আর হাসবি কী?

শান্ত হ'য়ে চেয়ে দেখি বছর দশেকের কালো একটি মেয়ে। পরনে গামছার মতো ছোটো একটা কাপড়। হাতে কয়েকটা রুপোর চুড়ি।

আমি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে? উত্তর দিলো, যে এতক্ষণ হাসছিলো সে, ওতো আমার পিসতুত বোন জহ্লাদি।

আমার আরো হাসি পেয়ে গেলো। ও বাবা! মানুষের নাম আবার জহ্লাদি? বইয়ে পড়েছি ঘাতকের নাম জহ্লাদ!

আমি বললাম, তুমি মানুষ খুন কর নাকি?

যে হেসেছিলো, সে ব্যস্ত হয়ে উত্তর দিলো, না না ও মানুষ খুন করে না। বললাম যে আমার বোন। আমার বিনিপিসির মেয়ে। ওদের বাড়ি ঐ নদীর টেরে তে-ঘরে ডাঙি।

আমাকে হাত ধরে দরজার কাছে টেনে নিয়ে ছোট্টো আঙুলটি তুলে দেখালো—ওই ওদের বাড়ি।

আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

আবার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, ওই আমাদের বাড়ি। ওই যেথায় গোরু, মহিষ চরছে।

সত্যই এবার দেখতে পেলাম মাঠের মাঝখানে বহুদূরে টিনের মাথা আর অস্পষ্ট কালো-কালো মহিষগুলো। ঘরের মাথা, মহিষ

তো দেখলাম, তোমার বোনের নাম জহ্লাদি তাও তো জানলাম, এখন তুমি কে বলতো ভাই ?

ও হেসেই খুন। ওমা তুমি আমায় চেনো না বুঝি ? আমার দাত্বকে তো সবাই চেনে। তুমি কিছু জানো না দেখি। হারাণ বাছাড়ের নাম শোনোনি ? ওই আমার দাত্ব।

জহ্লাদিও বলে উঠলো, আমারও দাত্ব হয়, ঠাইরোন।

আমি নেহাত বোকা ব'নে স্বনামধন্য পরিবারের পরিচয় নিলাম। তোমার দাত্বর নাম হারাণ বাছাড় তো তোমার বাবার নামটা কি ?

ও বললো, যতীন বাছাড়। আমার নাম সরলাবালা বাছাড়। আমার মা'র নাম দামিনীবালা বাছাড়। আমার তো মাস্টের আছে, তিনি নাম বলতি শিখিয়েছেন। আমাদের বাড়ি পাঠশালা করেন তিনি। হ্যাদে জহ্লাদি, মাস্টেরের ঘর জানি কোন্ গেরামে ?

জহ্লাদি বলে, খুলনে, খুলনে। তুমি চেনো না ঠাইরোন, সেই যেখান থেকে স্থবাস তেল, আলতা সাবান আনে ?

আমি মাথা নেড়ে সমর্থন জানাই। সরলাকে বলি, মাস্টারের কাছে কি বই পড়ো ?

সরলা উত্তর দেয়, 'বধুদয়,' 'হিতুপদেশ,' 'পদ্যমালা প্রথম ভাগ।' গর্বের স্থরে বলে, আমি অনেক বই পড়ি। রামায়ণও পড়তি পারি। দাত্বকে রোজ রামায়ণ পড়ে শোনাই যে।

মেয়েটির কাছে যা বিবৃতি পেলাম তার অর্থ—হারাণ বাছাড় একজন ধানী-পানি সম্পন্ন ব্যক্তি। তু'তিন হাজার বিঘে ধানী জমি, দেড়শো মহিষ, শো তুই গোরু, টিনের দোতালা বাড়ি ; বেশ স্বচ্ছন্দ অবস্থা।

হারাণ বাছাড়ের একমাত্র নাতনী, ছেলে যতীন বাছাড়ের একমাত্র মেয়ে। মেয়েটির বয়স বছর দশেক হবে। রং বেশ ফরসা। চোখ নাক-মুখে অপূর্ব সামঞ্জস্য। কোনোটা বেশি-কম নেই। গায়ে

সোনা-রুপো মেশা প্রচুর গহনা। মাথায় একরাশ কালো চুলের খোঁপা। তাতেও সোনার চিরুনি, সোনার ফুল, কাঁটা আর কয়েকটা রুপোর উচ্ছেফুল। গলায় সোনার কণ্ঠমালা। সাতনরী, চিক্, দড়া হার। নিচের কানে ফুল-ঝুমকো। উপরের কানে দু'টো পাশ-মাকড়ি। নিচের হাতে বালা। লিচু-কাটা সোনার বালা। কতগুলো রুপোর চুড়ি। উপরের হাতে সোনার অনন্ত। রুপোর তাবিজ, সোনার জশম। কোমরে রুপোর কাঁকড়া বিছে। পায়ে তোড়া, চারগাছা মল। পায়ের আঙুলগুলিতে আংটি। মাথায় একটা সোনার সিঁথি। পাটি-পাড়া চুল আঁচড়ানো। আঙুলে দু'টো সোনার আংটি, শাঁখার আংটি। পরনে নীল রঙের দামী পারশী কাপড়। গায়ে দামী সার্টিনের বডিস্।

মেয়েটির গায়ে আর কি কি গহনা ছিলো, আমি চিনি না। মোটের ওপর এই সোনা-রূপার গহনা-কাপড় পরা জবড়জং ভঙ্গি ওর ছোটো দেহখানিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিলো।

আমি বললাম, তুমি এতো গয়না পরেছো কেন ? ও লজ্জিত সুরে আমার দিকে চেয়ে বললো, তোমাদের রুপোর গয়না পরতে নেই, বুঝি ?

উত্তর দিই,—না।

ও বলে, তোমায় আমি মিতিন বলবো। তোমার মতো করে আমায় সাজিয়ে দাও না, মিতিন।

মেয়েটি সুকুমারী, লাবণ্যময়ী হলেও দুষ্টু বুদ্ধিও আছে। এক মিনিটে মিতিন পাতিয়ে নিলো।

আমি বললাম, তাহলে তোমার গহনা খুলতে হবে।

ও সব গহনা খুলে জহ্লাদির কাপড়ে দিলো। আমি বেশ করে বাথগেটের ক্যাস্টর অয়েলে ওর চিকন কালো চুলগুলি মেজে, আমার রবারের কাঁটা ফিতে দিয়ে, আলতো করে এলোখোঁপা বেঁধে

তাতে রুপোর উচ্ছেফুলকটি গুঁজে, আমার একটি রেশমি জাল দিয়ে ঢেকে দিলাম।

ও-যে কী খুশিই হলো! বললো, আমার কাছ থেকে কিন্তু জিনিস নিতে হবে মিতিন। আমি কিছুতেই শুনবো না। তুমি কত কি দিলে শহরের জিনিস।

আমি বলি, ভারি দামী জিনিষ কি না! তুমি আমার কাছে রোজ এসো, ভাই। তাতে খুব খুশিই হবো।

বলে, রোজ তো আসতে পারবো না, মিতিন। মাস্টেরের কাছে পড়তে হয় যে।

ওকে আমার বড়ো ভালো লেগেছিলো। বললাম, তুমি এসো। তুমি-আমি হু'জনেই লেখা-পড়া করবো।

ও খুব খুশি হয়ে বললো, সকালে তোমার কাছে পড়বো। সন্ধ্যেবেলা মাস্টের পড়াবে।

চোখ-মুখ টেনে বললো, মাস্টেরের খুব বিছে, মিতিন। বড়ো পাশ করেছে। এত বড়ো মোটা বই পড়ে, না জহ্লাদি?

জহ্লাদি গর্বের সঙ্গে মাথা নাড়ে।

তারপর জহ্লাদি ডাল নুইয়ে, কিছুটা গাছে উঠে আমের গুঁটি পাড়ে। নুন কচি আম দিয়ে মিতিন পাতানো উৎসবের শেষ হয়।

ওরা বেশ খানিকটা বেলায় কিছু কচি আম নিয়ে বাড়ি যায়। আমার সাজানোতে ওকে বড়ো মানিয়েছিলো।

ভেড়ির ওপর দিয়ে ও যখন হেলে-ছুলে যাচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো যেন বাসন্তী বাতাসের দোলা লেগে হেলে-ছুলে নুইয়ে পড়ছে আহ্লাদিনী পানলতা।

পরদিন সকালবেলা ঝিরঝিরে বাতাসে বটের ছায়ায় বসে আবার দাঁতন করছি। শরীরটা ভালো নেই। কেমন অলস ঘুম-ঘুম

লাগছে। হঠাৎ কে পদ্মফুলের পাপড়ির মতো ছোটো হাত দিয়ে আমার চোখ ছু'টি টিপে ধরলে।

আমি জেনেও তুষ্টুমি করে ভয়ের ভান করে বললাম, কেরে? বাবাগো!

জহ্লাদির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, তহোনি আমি কোয়েলাম যে ঠাইরোন ভয় পাবেনে।

সরলা কুণ্ঠিতভাবে চোখ ছেড়ে দিয়ে মুখ আঁধার করে দাঁড়ালো।

ওর বিমর্ষ ভাব দেখে ওর চিবুক ধরে আদর করে বললাম,—

মিতিন মিতিন সৈ,
মনের কথা কই ;
মিতে-মিতে মিঠে,
মিতিন-মিতিন তিতে,
দৈ, খৈ, সৈ,
মিতে আমার কই ?

এইবার ওর মুখে হাসি ফুটলো। বললো, এই যে।

ওমা! সত্যিই একটা নতুন হাঁড়িতে জহ্লাদির হাতে এক হাঁড়ি দৈ আর একটা কালো পাথরের বাটিতে এক বাটি খুব পুরু চটের মতো ছুধের সর।

ও বললো, মা খেতে বলেছে তোমাকে। তুমি আমার মিতিন হয়েছো শুনে মা, বাবা, দাছু খুব খুশি হয়েছে।

আমি বললাম, জিনিসপত্র দিলে আমি মিতিন হবো না কিন্তু। চলো তোমাকে সাজাই।

ও আজ একটি গহনাও পরে আসেনি। শুধুমাত্র হাতে লিচুকাটা সোনার বালাজোড়াটি।

আপিস-প্রাঙ্গণ থেকে বেলফুল তুলে শশী বোটম্যান রেখে যায় রোজ সকালে টেবিলের ওপর। ফুলের গহনায় সাজিয়ে দিলাম।

পরনে ছিলো একটা লাল ডুরে শাড়ি। কী চমৎকার দেখালো ওকে! যেন জীবন্ত বনের দেবী। ফুল মিশিয়ে বটপাতার সুন্দর মুকুট দিয়ে দিলাম মাথায়।

নির্জন বনদেশে ওদের সাথী পেয়ে, দিনগুলো বেশ কাটছিলো। কিন্তু অসুখটা আমায় বড় জ্বালাতন করলো। রোজ বিকেলে জ্বর আসে, খানিক রাত্রে ছেড়ে যায়। সকালে অবসন্ন মন সরলা মিতিনের হাসিতে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

ওর সরল মধুর হাসি, সুকোমল লাবণ্য আমায় মুগ্ধ করেছিলো। ওর হাসির কোনো মাত্রা নেই। কারণ-অকারণ নেই, বনের পাতা নড়লে হাসি, আকাশের রং দেখলে হাসি, পাখি উড়লে হাসি, নদীর ঢেউ দেখলে হাসি, আমার হাঁচি দেখলে হাসি, কাঁচের গেলাসটা ভেঙে গেলেও হাসি, কাঁচা আম জরানোয় লঙ্কার ঝাল লাগলেও হাসি—এ হাসি নির্মল, পবিত্র, সুন্দর।

এই হাসির মিষ্টি সুর যেন মিছরির টুকরোর মতো খচ্ খচ্ করে বেঁধে বুকে। মনকে দোলায় ভোলায়, জীবন-দৈন্যকে মুছে দেয়। যৌবন-প্রান্তের একান্ত সাথীটিকে ফিরিয়ে আনতে আজও মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

চাঁদপাই ফরেস্ট আপিসের নিকটে জীবধরা ফরেস্ট আপিসে এলেন সাহেবখালির সেই মেসোমশাই ভূপালবাবু। তিনি আমায় দেখতে এলেন।

মাসিমা দেশে। মেসোমশাই একাই ছিলেন। আমার অসুখ দেখে মেসোমশাই খুব ব্যস্ত হলেন। আমাকে বাগেরহাটে রেখে চিকিৎসা করতে পরামর্শ দিলেন। ঠিকও হলো।

সুঁদুরকাঠ গোলপাতার মধ্যে ঢুকিয়ে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলো।

চাপরাসী লোহার শিক ঢুকিয়ে ধরে ফেলেছে। এই লোহার শিক দিয়ে বাওয়ালী-নৌকা দেখার নিয়ম। এই মোকদ্দমায় স্বামী যাবেন বাগেরহাটে। আমাকে নিয়ে যাবেন।

সরলা বাগেরহাট যাওয়ার কথা শুনে আফসোস করে বললো, তে-ঘরি-ডাণ্ডির সখী-সোনার মা যদি ঝাড়িয়ে দিতো তেক্ষুনি জ্বর থাকতো না। কিন্তু ওরা এখানে তো আসবে না। গ্রামের মেয়েরা কেউ এখানে ফরেস্ট আপিসে আসে না। সরলা জহ্লাদি ছোটো মেয়ে; তাই আসতো।

একদিন জ্বরের ঘোরে দুপুরবেলা স্বপ্ন দেখলাম, আমায় যেন একজন বিধবা মেয়েলোক মাটি আর ঘোলাজল খাইয়ে দিচ্ছে। আমি যেন জিজ্ঞাসা করলাম, আমায় জলমাটি খাওয়াচ্ছো কেন? উত্তর দিলো, এ গঙ্গামাটি, গঙ্গাজল। এ খেলে তোমার অসুখ সেরে যাবে। ঘুম ভেঙে হাসি পেলো। এখানে গঙ্গামাটি গঙ্গাজল কোথায় পাবো।

কিন্তু এক ঘটনা হলো।

বিকেল থেকে ছিট্‌ছিট্ বৃষ্টির সাথে দক্ষিণা হাওয়া বইছে। মন কেমন-করা মেঘলা বাতাস আসছে সেই পশোর নদীর পার থেকে। হেতাল বনে পাতাগুলি সিরসির করে দুলছে। গভীর অরণ্য-স্নিগ্ধ, স্বচ্ছন্দ বাতাস এসে লাগছে আমাদের আম কাঁঠাল বনে। তারপর হুহু করে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে।

ভোরবেলা থেকে কে জানি মরা-কান্না কাঁদছে খালের ওপারে। খুব নিকটে। একে তো বনের বাতাসে উদাস হাহাকার, তারপর মাঝে-মাঝে বৃষ্টি পড়ছে। মন এমনিই বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে, তার ওপর আকুলি-বিকুলি কান্না।

আমার ঘরের পিছনের জানলাটা খুলে দেখলাম, খালের ওপারে ঠিক বাঁধটার কাছে ছোটো কুঁড়েঘর-ওয়ালা বাড়ির উঠোনে একজন

মেয়ে-লোক খুব কাঁদছে। মাঝে-মাঝে উঠোনে প'ড়ে পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়ছে।

বাড়িখানির চারদিকে কিছু বন্য ও কিছু আম নারকেল—গেরস্থালীর উপযুক্ত গাছ-গাছালি।

শশী বেটম্যান এলো ফুল দিতে। জিজ্ঞাসা করলাম, ও লোকটি কেন অমনি করে কাঁদছে।

ও বললো, ওই বুড়ীর নাম ভাদরি। ওর কেউ নেই। আজীবনের সঞ্চিত গোটা পঞ্চাশেক টাকা ওর ছিলো। সেই টাকাগুলি কর্জ দিয়েছিলো আমাদের আপিসের চাপরাসীকে। কাল কিছু সুদ দিয়ে চাপরাসী ওর টাকাটা শোধ করেছিলো। ও গভীর রাত্রে সেই টাকাটা উঠোনে পুঁতে জ্বালানী কাঠ চাপা দিয়ে রেখেছিলো। রাত্রে জানি কোন চোর বিনা পরিশ্রমে টাকাটা হস্তগত করেছে!

ও ভোরবেলা দেখতে পেয়ে এমনি কাঁদছে।

ওর বোকামীতে হাসিও পেলো আবার দুঃখে দুঃখ লাগলো। লোকটিকে শশীকে দিয়ে ডাকিয়ে আনলাম। বয়স ষাটের মধ্যে হবে। রঙটি উজ্জ্বল শ্যাম। নিরীহ ভালো মানুষটি। আমার সমবেদনায় ও আরো ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। বললো, কত দুঃখে না-খেয়ে কত কষ্টে ওই টাকা কয়টি জমিয়েছিলাম কাশী যাবার জন্যে।

তা বিশ্বনাথের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ওর ভাগ্যে নেই।

বলে, আর আকুলি-বিকুলি করে কেঁদে ওঠে।

আমারও ওর কান্না দেখে চোখে জল এলো। আহা, হতভাগ্য মানুষের মাত্র কয়েকটি টাকা!

আমি বললাম, আবার টাকা জমাও, তাই নিয়ে কাশী যেও।

ও দুঃখের হাসি হেসে বললো, মাগো, সে আর এ-জীবনে হবে না। কতদিন ধরে ওই টাকাগুলি আমরা করেছিলাম।

আমি বললাম, তোমরা মানে? তোমার স্বামী বুঝি? ও বললো, না, না, লোক। আমার স্বামী আমার সাত বছর বয়সে মইরে গেছে। আমি বিধুপা।

আমি না বুঝতে পেরে চেয়ে রইলাম। বললো, লোক রেখেছিলাম। এই নির্জন বনের মধ্যে কি একা থাকা যায়?

অবশ্য ও নিজের ভাষায় কথাগুলি বলছিলো।

ওর বাড়ি পূর্ববঙ্গে। বললো, বহুদিন,—যখন এখানে আবাদ হয়নি কেবলমাত্র চিলের কাছারি, ফরেস্ট আপিসটি, মাত্র নতুন তৈরি হয়, সেই থেকে ও এখানে আছে। আপিসে কাছারিতে সেই থেকে সব কাজ ও করতো। তাই সবাই ওকে ভালোবাসেন। তখন দিন দুপুরে বাঘে মানুষ নিতো। এখানে নদীর জলে ছিলো তীব্র বিষাক্ত সাপ কুমির। নিচু জলায় নলবনে ছিলো সহস্র সাপের আড্ডা, তারপর তো বাচড়া কেটে আবাদ হলো, লোক এলো।

আমাদের পুরষো লোকই তো বাদা কাটার সর্দার ছিলো। টাকা কামাইলো খুব।

আমি বললাম, সে-টাকা কি হলো।

মরবার সময় তিন বছর বইসে খেইয়ে গেছে।

আমি বললাম, সে বুঝি বুড়ো ছিলো?

না না, বুড়ো কেন হবে? আমার যেমন বয়েস, তেমনি দেখাইতো।—লোক রাখিলাম।

এইবার লোকে'র অর্থ বুঝলাম!

বললো, হ্যাশেই ওর লগে ভালোপাসা হইছিলো, মাঠাকরুন, তাইতো পালাইয়া আইলাম। সে তোমারে কি কবো মাগো, আমি হাঁইট্টা গেলে দুঃখ পাইতো!

দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে চোখের জল মুছলো।

বুড়ীর কপালে মাটির তিলক দেখে জানতে চাইলাম।

বললো, গঙ্গামাটি।

আশ্চর্য হয়ে ওর কাছে গঙ্গামাটি চাইলাম। ও আনতে গেলো। বলে দিলাম, তুমি রোজ সকালে আমার এখানে এসো। সারাদিন আমার সঙ্গে গল্প করবে, তারপর খেয়ে-দেয়ে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি যাবে।

খুশি মনে চলে গেলো।

দেবেনকে ওর ভাতের কথা বলে দিলাম। আপিসের তো ভাতের মা-বাপ নেই, না হয় একটা অসহায় প্রাণী খেয়ে বাঁচুক।

ও হাতে একটি বাঁশের ছোটো চোঙা ও গঙ্গামাটি নিয়ে ফিরে এলো। হাসি মুখে বললো, এই চুঙোবাটাল নিয়ে আলাম। পান না-খেয়ে এক দণ্ড পারিনে, মা।

আমাকে চুঙো বাটাল দেখালো। বাঁশের চোঙের মধ্যে এক খণ্ড চন্দনকাঠ পোরা। একখানা ভাঙা ডাঁটি দিয়ে বুড়ী পান গুঁতোয়। বেশ সুন্দর চন্দনের গন্ধ ভুর-ভুর করে।

আমার পনেরো বছরের মনে চুঙো-বাটালের স্বপ্ন ছিলো। একদিন উত্তরকালে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে চন্দন কাঠের চুঙো বাটালের ছেঁচা খেয়েছিলামও।

•

আমার অসুখ দেখাবার জন্য বাগেরহাটে রওনা হলাম। রামপালের ধার দিয়ে কত নদী পেরিয়ে সেই বাগেরহাটের কমল-কুমারী ঘাটে পৌঁছে গেলাম।

এই চার বছর পরে আবার দিদির জা জিয়াগঞ্জের ভাতুদিদির সঙ্গে দেখা হলো। ভাতুদিদির একটি মেয়ে হয়েছে। চেহারায় বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখলাম না। তবে পরিবর্তন দেখলাম স্বভাবের। কেমন যেন জানা-শোনা—যেন গিন্নী-গিন্নী ভাব।

বাগেরহাটের যতিনবাবু এম. বি. আমাকে চিকিৎসা করলেন।

এর মধ্যে এক মজার কাণ্ড ঘটেছিলো। চাঁদপাই থাকতে ভাদরি বুড়ীর গঙ্গামাটিতে সত্যই আমার জ্বর সেরেছিলো।

বাগেরহাটে আসতে হলো অন্য অসুখের জন্য।

বাগেরহাট থাকতে একদিন ওখানকার বিখ্যাত ষাটগম্বুজ দেখতে গিয়েছিলাম। ষাটগম্বুজ একটা বিরাট কীর্তি। নিচে পাথরের থামের উপর ষাটটা গম্বুজ। ছু'দিক দিয়ে উপরে ওঠবার সিঁড়ি। কাড়াপাড়া যাওয়ার পাকা রাস্তার ধারে এখানে একটা দীঘি আছে। তার নাম ঘোড়া দীঘি। এক দৌড়ে ঘোড়া যতোটা পথ যেতে পারে অত বড়। এই ষাটগম্বুজটি নাকি খাঞ্জালী সাহেবের কাছারি বাড়ি।

এর খানিকটা দূরে গ্রামের মধ্যে খাঞ্জালীর দীঘি নামে আর একটি দীঘি আছে। সেখানে সেই খাঞ্জালী সাহেবের কবর। এখানে বাৎসরিক মেলা হয়।

দীঘিটি শ্যাওলা পানায় ভরা। ভাঙা সিঁড়িওয়ালা। চারদিকে জঙ্গল। বুনো কুলগাছ ভরা। স্থানটি বেশ নির্জন। শান্তিপূর্ণ। একটু দূরে একজন ফকির থাকেন। তিনি আমাদের সব দেখালেন। আমরা জলে নেমে স্নান করলাম। যাদের ছেলেমেয়ে হয় না,তাদের ওই জলে স্নান করে মানসিক করলে নাকি মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

আমরা স্নান সেরে উপরে উঠতে এক মজার ব্যাপার হলো। আমাদের সঙ্গের ফকিরসাহেব জানি কাদের আয়-আয় করে ডাকলেন। সারাদীঘির জলটা যেন আন্দোলিত হয়ে উঠলো। মাছের মতো দাঁড়া ভাসান দিয়ে পর পর ছুটি কুমির এসে সিঁড়ির উপর মাথা তুলে দাঁড়ালো।

আমরা তো ভয়ে মরি। শুনলাম, এরা কালাপাহাড়, ধলা-পাহাড় কুমিরের বাচ্চা। এদের মা-বাবার কাছে নাকি অপুত্রক লোকেরা মানস করতো—ছেলে হলে দিয়ে যাবে।

যেতোও নাকি। ছেলেটিকে নাকি সিঁড়ির ওপর শুইয়ে রাখতো। কালাপাহাড় ধলাপাহাড় এসে ছেলে নিয়ে যেতো। একটু পরে আবার অবিকৃত অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে যেতো।

আবার এরাও তো বেশ শান্ত। আমরা চান করবার সময় জানতেও পারিনি যে ওরা আছে।

তারপর কুমির ছয়টিকে ছোটো-ছোটো মুরগীর বাচ্চা লাঠির মাথায় দড়ি বেঁধে খাওয়ানো হলো। কুমিরগুলি অর্ধেক শরীরটা উপরে তুলে কেমন বেশ আমাদের 'দলের লোক' হয়ে গেলো।

কিন্তু একটা কাণ্ড ঘটে গেলো। আমাদের সঙ্গে একটি বাচ্চা চাকর ছিলো। সে একটা বাঁশের লাঠি কোথা থেকে এনে একটি কুমিরের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। কুমিরটি হাঁ করে গিলতে গেলো ওকে।

খালের সাপ খোঁচালে যা হয়।

আমরা ভয়ে-ভয়ে চলে এলাম সেদিন।

এখনো সেই শেওলা-ঢাকা নির্জন দীঘির স্বচ্ছ কালো জলটুকু মনে পড়ে। আর মনে পড়ে তার বাসিন্দা বড়ো-বড়ো সিঙি মাছ, কুমিরদের।

বাগেরহাট থেকে আবার একদিন রওনা হলাম। পথে সুন্দরবনের মধ্যে এক জায়গায় স্নান করতে নামা হলো। সেখানে বেদেরা চাষ-আবাদ করে। আমাকে দেখবার জন্য অনেক বেদিয়া মেয়ে-পুরুষ সমবেত হলো। ওরা আমার গহনা-কাপড় ও আমাকে উল্টেপাল্টে দেখলো। একজন বেদিয়া যুবতী আমাকে একটি কেয়া-কাঁঠাল খেতে দিলো। কেয়া-কাঁঠাল মানে কেয়াফল। দেখতে কাঁঠালের মতো ছোটো ছোটো কোষ, মিষ্টি-তেতোয় মেশানো।

ওই বেদে মেয়েটির সঙ্গে আমার খুব ভাব হলো। মেয়েটি অপূর্ব স্বাস্থ্যবতী ও সুশ্রী।

তারপর সন্ধ্যায় নৌকা ভিড়লো চাঁদপাইয়ের সন্নিকটে জীবধরা ফরেস্ট আপিসে। সবাই নেমে গেলো উপরে।

সন্ধ্যার স্বল্পান্ধকারে বসে চুল বাঁধছিলাম। কে জানি ছায়ার মতো এসে দাঁড়ালো। আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কে? ছায়াময়ী স্পষ্ট কোমলকণ্ঠে উত্তর দিলো, আমি সরমা। আমিও বললাম, "সরমা সুন্দরী, রক্ষকূল রাজলক্ষ্মী, রক্ষ-বধূ বেশে?"

বধূবেশে নয়, ও উত্তর দিলো, জীবধরা ফরেস্ট আপিসের উপেন বাবুর মেয়ে রূপে। তাড়াতাড়ি চলুন। বৌদি, মা আপনাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন।

ওর একরাশ ঝাঁপানো চুল ছাড়া দেখে বললাম, তোমার চুলটা বেঁধে দেবো ভাই? ও বললো, উপরে যেয়ে দেবে।

মেয়েটি আমার সমবয়সী। উপরে গিয়ে আলোকে দেখলাম রূপসীও বটে।

আর দেখেছিলাম এক অপূর্ব সৌন্দর্য। দেখলাম, ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে বয়স হবে, মাথায় এলানো পিঠভরা ঝাঁপানো চুল; নিচু হয়ে বসে ভাঁড়ার-টাঁড়ার কি সব বের করছেন। কোমল হাতে সোনার কঙ্কন। সরমার মা। রাজকন্যার মতো কোমলাঙ্গিনী। রূপ বটে। নধর ননীর শরীর। আর যদি বলি, অমন চুল চোখে কোনোদিন দেখিনি, শুধু উপন্যাসেই পড়া যায়। নিবিড়, কালো, সুচিক্কণ রেশমী চুলের রাশি। ওঁর মাথায় হাত দিয়ে চুল মুঠো করে দেখে ছিলাম। হাতে ধরলে একমুঠো হয়ে যায়। ছেড়ে দিলে মাথায় ধরে না।

ওঁরা খুব যত্ন করলেন আমাদের।

সরমা ঠাকুরঝি কিন্তু লঙ্কাবীজের পানের খিলি খাওয়াতেও ভোলেনি! চোখের জলও পড়েছিলো বেশ।

চাঁদপাই ফরেস্ট আপিসে ফিরে এসে আবার আমার সাথী হলো ভাদরি বুড়ী ও সরলা মিতিন। মাঝে-মাঝে ভাদরি সকাল বেলা এসে

আমার অতিথি হয়, সন্ধ্যায় বাড়ি যায়। সরলা, জহ্লাদি রোজ সকালে আমার কাছে আসে। বাড়ির মধ্যের পেয়ারাগাছগুলির পেয়ারার শ্রাদ্ধ করি তিনজনে। মাঝে-মাঝে কাঠবাদামও বেশ চলে। কিন্তু কাঠবাদাম ওরা কাটতে জানে না। আমিই কেবল সুদক্ষ।

তিনজনে মিলে নানারকম বেলফুলের গয়না তৈরি করি।

বর্ষায় খড়মা হয়েছে পূর্ণা। জলও বেশ মিষ্টি হয়েছে। খড়মার জল দিয়ে এখন রান্না হয়। খড়মাতে এখন প্রচুর মাছ পড়ছে। বড়ো বড়ো ভাঙান পারসে আর বাগদা চিংড়ীই সব থেকে বেশি।

একদিন বেশ মজা হলো। বিকেলবেলটা বড়ো ভাঙান মাছ রান্না করছি ; আর মিষ্টি কুমড়ো ছেঁচ্‌কি। ছেঁচ্‌কিতে মিষ্টি দেবো বলে বড়ো ঘরে যাচ্ছি চিনি আনতে ; যেই কাঠের সিঁড়ির উপর উঠেছি অমনি সিঁড়িটা আছড়ে আমায় নিচে ফেলে দিলো।

তবুও জোর করে উপরে গেলাম। তখন টেবিল, চেয়ার, খাট, আলনা সব ঝাঁকা-ঝাঁকি করছে। কে ?

ভয়ে নিচে নেমে এলাম। তখন এক রৈরৈ কাণ্ড। খড়মার জল সব ছলাৎ ছলাৎ করে উপরে উঠে আসছে। আর তার সঙ্গে ভেটকী, চিংড়ী নানানি-বিমুনি মাছ। কত লোকেই ধরলো। সুন্দরবনে ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম।

ভরা শ্রাবণে খড়মার ওপারে কাক-ডিম-রঙা কাজল সজল মেঘ জমে। খড়মার বুকে তার ঘন কালো ছায়া পড়ে। তখন মনে পড়ে কবির গান ঃ

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে,
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।

আবার যখন শ্যামল বনে বাদল বাতাসের মাতামাতি, তখন আবার মনে পড়ে ঃ

পবন মাতিছে বনে বাদল-গানে।

বর্ষা গেলো। শরৎ এলো। কিন্তু বনভূমির বিশেষ বৈচিত্র্য দেখা গেলো না। শুধু শ্যামপত্রের বাহুল্য। নদীর পূর্ণতা।

সুন্দরবনে বর্ষা ও বসন্তই সব থেকে ভালো লাগে। হেমন্তের দিগদিগন্ত হারা সোনালী ধানক্ষেতও উপভোগ্য।

সরলা মিতিন কিন্তু বেশ লেখাপড়া শিখে ফেলছে দিন-দিন। আমার সঙ্গে বইও পড়ে বেশ। পেয়ারা যা খাই দুজনে!

খালের পারে বাঁধের ঠিক উপরটায় ডালিম গাছে ঘেরা ভাদরি বুড়ীর ঘর। ও ঘোরে-ফেরে আমার দিকে হাসি মুখে চায়। আমিও ইশারায় জানলা দিয়ে ডাকি।

চাঁদপাই আপিসটা ছিলো শুধু কান্নার জায়গা। ভাদরি বুড়ীর সঙ্গে পরিচয় হলো কান্নার মধ্যে দিয়ে। আর একদিন দেখেছিলাম চূড়ান্ত কান্না।...ভাদরির সঙ্গে মধ্যাহ্ন অবসরে বসে গল্প করছি। এমন সময় কী কান্না?

একটা বাড়ি, ভাদরির বাড়ির পাশেই। একটা জলভরা আড়ার মধ্যে একট বছর পঁচিশের মেয়ে পড়ে কাঁদছে। আবার একটি বুড়ো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। একটি জোয়ান ছেলেও কাঁদছে সেই আড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ব্যাপারটা জানতে চাইলাম ভাদরির কাছে।

ও বললো, ওই পঁচিশ বছরের মেয়েটির একটি চার বছরের ছোটো মেয়ে ওই আড়ার ভিতর ডুবে মরেছে। মেয়েটির বড় দুঃখের সন্তান! 'ও তো ঘরের না। পরের কখনো শান্তি-স্বস্তির সন্তান মেলে?'...তাই ওর বড় লেগেছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে ভাদরিকে জিজ্ঞাসা করলাম, পরের মানে?

ও ওর নিজের ভাষায় আমায় বললো,—মেয়েটির স্বামী

নপুংসক। সন্তানটি আসলে ওই মেয়েটির হলেও তার বাপ আলাদা। ওদেরই স্বেচ্ছায় ওই সন্তান ওরা নিজের করে নিয়েছিলো।

আমি অবাক্ হয়ে নপুংসক পিতার ও ঠাকুরদাদার কান্না—করুণ কান্না শুনলাম।

কার্তিক মাস এলো। দেশ থেকে জা-দেওর ও একটি ছোটো ছেলে-চাকর আমাদের এখানে বেড়াতে এলো। সরলা ভাদরির আনাগোনা কম হয়ে উঠলো।

আমি জায়ের সঙ্গে গল্প-গুজব করি।

পৌষ মাসে সুন্দরবনে ধান পাকলে নানারকম পণ্যের নৌকা আসে। হাঁড়ি-মালসা, সরা-কলসির নৌকা বিচিত্র রং-করা ছোটো সরা, হাঁড়ি, পুতুল হাতি-ঘোড়ার নৌকা, কমলালেবুর নৌকা। নৌকাগুলি জিনিস-পত্র ভরে আসে। যাবার বেলা জিনিসের বিনিময়ে ধানভর্তি করে ফিরে যায়। কৃষাণ মেয়েরা ধানের বদল দিয়ে সারা বছরের জিনিস কিনে রাখে।

আর আসে একদল বেশ মজার মানুষ। নৌকা ভর্তি বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা গান গেয়ে ভিক্ষা করে নৌকা ভরে ধান নিয়ে বাড়ি ফেরে।

সুকণ্ঠি বৈষ্ণবীরা আমার বাড়ির ভেতর ভিড় জমাতো। ওদের দক্ষিণা দিতে হতো বেশ।

দুজন বৈষ্ণবীকে এখনো মনে আছে। একজন চাঁদুবালা, আর একজন রঙ্গিনী। রঙ্গিনীই বটে। যৌবনরসে টল-টলায়মান মধুর কণ্ঠে, একহারা শ্যামালতার মতো দেহ-ভঙ্গিমায় মজায়।

আর চাঁদুবালা, সেই সোনার বরণী মেয়ে যেন হেমন্তের শিশির-সিক্ত ভরা-ধরা ধানক্ষেত। মানুষকে পূর্ণ করে দেয়।

এই দুটি বৈষ্ণব মেয়ের কীর্তন গান এখনো যেন সারা মনে ছেয়ে আছে। এখনও শুনতে পাই রঙ্গিনীর মন-আকুলকরা সুর ঃ

বঁধু, কি আর কহিব আমি—
জীবনে মরণে জনমে-জনমে
প্রাণনাথ হয়ো তুমি।
তোমার জীবনে আমার পরানে
লাগিল প্রেমের ফাঁসী,
বঁধু, তোমার চরণে মন সমর্পিয়ে
নিশ্চয় হইনু দাসী।

আত্মসমর্পণের প্রাণভরা আকৃতি।

জা, দেওর, আমাদের কাছেই আছে। ভীষণ শীত পড়লো পৌষ মাঘ মাসে। সৌগন্ধী বাঁশফুল আতপের ভাত, তৈলাক্ত কুলকে টেংরা গলদার ঝাল-ঝোল, বড়ো ভেটকির চচ্চড়ি প্রচুর হাঁসের ডিম, মাখন-ভাসা খাঁটি গোরুর দুধ। দুধে হাত দিলে হাতে-ভাতে যেন ঘি জড়িয়ে যায়।

সারাদিন বাড়ির মধ্যে আটকে থাকি। রাত্রিবেলা শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন জ্যোৎস্নায় কাটা-ধান ক্ষেতের মধ্যে ভেড়ি বেয়ে দু'জায়ে ছোটো চাকরটার সঙ্গে বেড়াতে বের হই। অবশ্য উপরওয়ালার সমর্থন ছিলো।

জনমানবহীন নির্জন প্রান্তর কুয়াশাচ্ছন্ন হিমেল-জ্যোৎস্নায় ভাসমান। দূরে আঁকা-বাঁকা খড়মার ধারের ঝাপসা বন-রেখা। বামে ছোটো খালের ধার দিয়ে ভেড়ির পথ। নতুন ধানের শিশির ভেজা মিষ্টি গন্ধ-বহা শীতেলি মেঠো হাওয়ায় শুধু চলেছি। দিগন্ত-হারা প্রান্তরের প্রসারতায় ছোট্টো মনটা হারিয়ে গেছে, ভেসে গেছে। জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন নির্জন প্রান্তরভূমি স্বপ্ন-সৌন্দর্যময়ী। কোন নতুন পৃথিবীর তলায় বিন্দুর মতো আমরা।

খড়মার বাঁকের মাথায়, প্রান্তরের শেষ সীমানায় কোন ভীমরাজ মুচির কুঁড়েঘর। ওর বাড়ি জানি কোন পাথরা গ্রামে। প্রতিবছর

ধানের সময় আসে ও। বেত বাঁশের টুকরি ব্যাগ, সুন্দর-সুন্দর সব জিনিসপত্র হাটে বেচে বছরের ধান সংগ্রহ করে ও দেশে ফেরে।

ভীমরাজ মুচিকে কখনো চোখে দেখিনি। সবাই বলে, ও শীতে ঘুমুতে পারে না। তাই সারারাত গান করে কাটায়।

নির্জন বনপ্রদেশে এক-একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ জেগে সেই মেঠো গানের সুরের সাথে তার গুপিযন্ত্রের অস্পষ্ট দূরাগত আওয়াজ শুনি, গুপ্—গুপ্—গুপ। খড়মার মৃদু জল-কল্লোল-মেশা গভীর রাতের সেই সুর আমায় রহস্য-অভিভূত করে তোলে।

একদিন হঠাৎ আমার সরলা মিতিন এলো জহ্লাদির সঙ্গে লাল ডুরে শাড়ি, একগা গহনা পরে। ওর নাকি বিয়ে, রামপালের ধারে কোন বাঁশতলা গ্রামে।

জা, দেওর আসার পরে বড় একটা আসতো না। তবু ভাবতাম আসবে।

আসন্ন বিদায়ের বেদনায় মনটা বড় ব্যথাতুর হয়ে উঠলো। মুখে হাসি টেনে বললাম, মিতেকে পেলে আমাকে আর মনে থাকবে না, না মিতিন?

ও এতক্ষণ আমার আঁচলের চাবি-গোছা নাড়া-চাড়া করছিলো, এইবার আমার হাতখানা টেনে গলার 'পরে রেখে কেঁদে বললো, তোমাকে ভুলে যাবো না। আমাকেও ভুলে যেও না, মিতিন।

বেদনা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে ছোট উত্তর দিলাম, না, কখনোও ভুলবো না।

ও অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, তুমি যেখানেই থাকো আমি চিঠি দেবো। আমার হাতখানা গলায় চেপে কতক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদলো। আমি সাদরে বুঝিয়ে চোখের জল মুছে দিলাম।

বিষাদিনী পানলতা আজ প্রতিকূল বাতাসে নুয়ে-নুয়ে ভেড়ি বেয়ে চলে গেলো।

সরলা মিতিনের বিয়ের ভেট এলো আপিসে। মাছ, পাঁঠা, দৈ, চাল, ডাল, তরি-তরকারি, নুন, ঘি, মিষ্টি। গ্রামে কোন ক্রিয়া-কর্ম হলেই, সব জায়গায় এমনি ভেট আসতো।

মিতিনের বিয়ের বাজনা শুনতে পেলাম দূর থেকে। এই বনের মধ্যেও কোথা থেকে বাজনা সংগ্রহ করেছিলো।

জহ্লাদির কাছে শুনলাম, ওরা বাঁধের উপর দিয়ে নৌকায় উঠবে। আমার ঘরের পিছনের খালটি মিশেছে খড়মায়। সেই খালের মধ্য দিয়ে ওরা যাবে।

প্রতীক্ষায় থাকলাম।

খোলা ডিঙিতে মিতিনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা, মিতেকে দেখলাম, বুদ্ধি উজ্জ্বল সুশ্রী একটি কিশোর ছেলে। মিতিনের পাশে বেশ মানিয়েছে। মিতিনের সঙ্গে মিতেও আমার দিকে চেয়েছিলে পরম আগ্রহভরে। সেই বিদায় করুণ সান্ধ্য জোয়ারে হংস-দম্পতির মতো ভেসে চলে গেলো ওরা দূর-দূরান্তরে।

আর কোনোদিন দেখা হয়নি মিতিনের সঙ্গে। জীবন-যৌবনের পরপার থেকে •ব্যথা ছলোছলো জলভরা দুটি আঁখি কখনো ভোলবার নয়।

মাঘ মাসে কাছারিতে কালীপুজো হলো। কাছারির জমিদার দশআনি গ্রামের মহেন্দ্র বিশ্বাস।

বাগেরহাটের ক্ষেত্রনাথ মিত্র এলেন কাছারি দেখতে। ওঁরা বেশ আলাপি ভদ্রলোক। ওঁদের জলখাবার খাওয়ানো হলো একদিন আপিসে।

কালীপুজোর কয়েকদিন আগে হঠাৎ দুপুরবেলা কাছারিতে আগুন লেগে গেলো। সে কি কাণ্ড! কালীপুজোর বাজার সমেত নৌকা বাঁধা ঘাটে। তার পালখানা পর্যন্ত পুড়ে গেলো।

খাট পুড়েছে, চেয়ার পুড়েছে। টাকা সমেত লোহার সিন্দুক জ্বলেছে আগুন হয়ে। হুলুস্থুল ব্যাপার। আমরা দু' জা তো ভয়ে বাড়ির মধ্যে শুধু দৌড় দিচ্ছি। সব পুড়ে গেলো। কিছু টাকা বেঁচে ছিলো। তাও গোলমালে, চুরি হয়ে গেল।

সব পুড়ে ছাই হয়ে গেলো শুধু অবশিষ্ট, অক্ষত রইলো ওঁদের দাবার থলিটি। মুহুরী মদনবাবু ও স্বামী তো দাবার থলিটি পেয়ে পরম খুশি। এ-দুর্যোগে ওটি খোয়া গেলে ওঁদের আরও কষ্ট হতো!

তবু শেষ অবধি কালীপুজো হলো। প্রজারা কিছু ঘর দু'দিনের মধ্যেই তৈরি করে ফেলেছিলো।

আর একদিন ঘটলো আর এক মজার ব্যাপার।

আমার দেওর যে শখের ছোকরা চাকর সঙ্গে এনেছিলো, তার নাম যতিন। বাড়ি বরিশাল জেলায়। রান্নার লোক নকুল আর যতিন ওরফে যতে কি জানি কথা বলছিলো। বোটম্যানরা আর সবাই ছিলো আপিসে।

এর মধ্যে যতের আর্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেলো, দাদাবাবু, দাদবাবু!

দাদাবাবু বলে ও-দেওরকে ডাকতো।

—তারপর দাদাবাবু উল্‌টে শোনা যেতে লাগলো, বাবাদাদু, বাবাদাদু! তারপর গোঙাতে-গোঙাতে ও অজ্ঞান হয়ে গেলো।

সবাই ছুটে এলো। কী হলো কে জানে।

অনেক পরে ওর জ্ঞান হলে ওর কাছে বিবরণ শোনা গেলো: ও নাকি আপিস থেকে যখন বাড়ি গেলো, নকুল ল্যাম্পের আলোয় বসে রান্না করছিলো। মাটিতে তামাক-সাজা একটি কলকে নকুল খেয়ে রেখেছিলো। যতে নাকি সেই কলকেয় তামাক খেতে-খেতে বললো, আচ্ছা নকুলদা, হরি কি আছেন?

নকুল নাকি হেসেছিলো।

তখন নাকি ও নকুলের ছু'টো মুখ দেখতে পায়। তখন ও বাইরের দিকে চায়। বাইরেও একটা মুখ দেখতে পায়। তখন ও দাদাবাবু, দাদাবাবু করতে থাকে।

দাদাবাবু বাবাদাছ্ রূপান্তর!

ওকে খানিকটা তেঁতুলগোলা খাওয়াতে তবে জ্ঞান হয়েছিলো।

পরে একটা গুঞ্জন, ফিসফাস শুনেছিলাম, ওই কলকেটিতে নাকি বড়তামাক সাজা ছিলো। নকুল খেয়ে রেখেছিলো। ও ছেলেমানুষ, না-জেনে খেয়ে ঘরে বাইরে ওর ওই হরির মুখ দেখা!

চিলে কাছারিতে কবিগান হলো। বরিশালের ঝালোকাটি থেকে কবিগানের দল এলো। কবিদলের মধ্যে দশ-বারোজন মেয়েলোক। সারারাত গান হলো। সকালবেলা ওদের দেখলাম। কবিগান শুনলাম অবশ্য ঘরে বসেই। কী আশ্চর্য! ওরা কেমন নিজেরা মুহূর্তে ছড়া রচনা করে। ছুই দিনে বিতর্কে হারায়। বেশ লাগলো ওদের গান।

কবিদলের মেয়েরা একটি সুন্দর কাগজের ফুলগাছ তৈরি করে স্বামীর কাছ থেকে পাঁচটাকা পুরস্কার নিয়ে গেলো। কবি মেয়েরা বাড়ির মধ্যে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলো, কিন্তু দেখা করতে দেওয়া হয়নি। দূর থেকে ওরা চেয়ে-চেয়ে চলে গেলো।

বাগেরহাটে দেখেছিলাম এমনি এদের মতো ছুটি পতিতা মেয়েকে। ওদের কী সংসারের সাধ! একটি মেয়ের নাম গিরিবালা, আর একটি মেয়ের নাম দাসী।

বাগেরহাটে আমাদের দেশের একজন লোকের ময়রার দোকান ছিলো। সুন্দরবন থাকাকালীন ওদের বাসায় কয়েকদিন থাকতে হয়েছিলো আমাদের। ঠিক নদীর উপরটায় বাসা। বাসার সামনের বাইরের ঘরটা ওদের দোকান-বাজার।

একটি পতিতা মেয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো বাড়ির মালিক্। বাসায় তার বিধবা মা, ছোটো দু'বোন। মেয়েটিকে খাওয়া-পরা, কিছু হাত খরচ, তার বাসাভাড়াটা দিয়ে নিজের করে রেখেছিলো।

সেই মেয়েটিরই নাম দাসী। একহারা লম্বা সুশ্রী চেহারা। গায়ে মালিকের দেওয়া দু-চারখানা গহনা। কপালে একটা সোনার টিপ। বয়স কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে। মেয়েটি ওদের বাসায় দু'বেলা খেয়ে যেতো। থাকতো পতিতা পল্লীতে। তার হাত-খরচের টাকা থেকে মালিকের বিধবা মায়ের জন্য কুমড়ো শাকটা, লাউডগাটা, তামাকপাতা শাশুড়ী হিসাবে বাজার করে আনতো! শাশুড়ী কিন্তু তরকারি জিনিস পেয়েও পুত্রবধূর ওপর খুশি হতেন না। তরকারি থেকে আরম্ভ করে মেয়েটি যেখানে বসতো সেখানে সাতবার গঙ্গাজল গোবরগোলা ছিঁটিয়েও সন্তুষ্ট হতেন না।

মেয়েটি বাঁধানো উঠোনে পেয়ারাতলায় বসে দুবেলা ভাত খেয়ে উঠোন ধুয়ে-মুছে, নদীর জলে বাসন মেজে দাওয়ায় উপুড় দিয়ে রাখতো। মালিকের বোন দুটিকে সমাদরে মুছিয়ে-গুছিয়ে, চুল বেঁধে আলতা টিপ পরিয়ে দিতো। রোজ সন্ধ্যায় কত তেপান্তরের রূপকথা বলে শোনাতো মেয়ে দুটিকে।

রূপে, গুণে, কাজেকর্মে ওকে বধূ বলে মনে হতো। গৃহস্থ বধূর মতো ওর চলা-বলা কর্ম-নিপুণতা অপূর্ব।

ওর দুটো জিনিস শুধু চোখে লাগতো। ও অনেক সময় বিড়ি খেতো। অবশ্য শাশুড়ীর সম্মুখে নয়। আর ছিলো রূপসজ্জার নিপুণতা। একগোছা চুলেও বড় একটি খোঁপা বাঁধতে পারতো। আমরা কতদিন ওর কাছে চুল বেঁধে তুলসী-জল স্পর্শ করেছি।

দাসীর সঙ্গে আসতো আর একটি মেয়ে। নাম তার গিরিবালা। মোটা-সোটা হাসিখুশি সপ্রতিভ। বেশ লাগতো তাকে। দেব-দ্বিজ, শাঁখা-সিঁদুরে অচলা ভক্তি।

সে আমাকে শাঁখা পরিয়ে দিয়েছিলো। শুনেছিলাম ওর পতিতা-জীবন শুধু ভাগ্যের ফল। একজনের পায়ে ও বিকিয়ে আছে। শাঁখা পরাবার সময় ওকথা বললো। তার অতীত, স্বামী সংসারের কথা। সেও এমনি শাঁখা-সিন্দুর পরতো। স্বামী তাকে কত ভালবাসতো। সোমত্তকালে তার শাঁখা-সিঁন্দুর ধুয়ে-মুছে গেলো। তাই ভুল করে এই দশা। আজ তার মন ঘরে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু সেতো হবে না। তবু তার সমব্যবসায়িনী বন্ধুদের মতো সে সবকিছু পারে না, ঘেন্না করে।

পরে জীবনে চলবার পথে আরও কয়েকটি পতিতা মেয়েকে দেখেছিলাম। একবার 'সরোজ নলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতি'র প্রদর্শনী উপলক্ষে গ্রাম্য শাখা-সমিতির জিনিস নিয়ে কয়েকজন মেয়ে যাচ্ছি কলকাতায়। যশোর স্টেশনে খবরের কাগজ পড়ছিলাম সবাই মিলে।

একটি মেয়ে আমাদের পাশে এসে বসলো। একহারা সুন্দর ফরসা চেহারা। মাথায় কাপড়। বাঁকা সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া। তখন ভদ্রঘরের মেয়েরাও বাঁকা সিঁথি কাটতো।

ও বললো, আপনিরা কাগজটা পড়ে আমায় শোনাবেন? আমার খবর শুনতে খুব ভালো লাগে। আমাদের সরোজিনী মাঝে মাঝে পড়ে। আমরা সবাই শুনি।

আমি একটু আশ্চর্য হলাম। ভদ্রলোকের বউ, বামুন কায়েস্থই হবে। লেখাপড়া জানে না, এ কেমন?

ও সাগ্রহে শুনলো আমরা সমিতিতে যাচ্ছি।

শুনে বললো, আমারও ওই সব করতে বড়ো ইচ্ছা করে।

আমাদের শিল্প কাজগুলি মন দিয়ে দেখলো। যাচ্ছে রানাঘাট বোনকে দেখতে। বউটি একাই যাচ্ছে। টিকিট কাটতে চলে গেলো।

আমাদের সঙ্গে যে পুরুষ লোকটি ছিলেন, তিনি তো রেগেই বাঁচেন না ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেছি বলে। বুঝলাম, মেয়েটি সমাজ স্বীকৃতিহীনা।

আর একটি মেয়ের জীবন-স্বীকৃতি, ক্লান্ত কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে পেয়েছিলাম একদিন। এখনও সেই কথাটি উল্‌টে পাল্‌টে ভাবি। আর বিদ্রূপের মতো মনে খোঁচা দেয়।

তখন আমার বয়স সাত কি আট। বেশ খানিকটা রাত হয়েছে, রাতটাও খুব অন্ধকার ছিলো। কি ভাবে জানি আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। বাড়ির বড়রা তখনও খাওয়া-দাওয়া করছিলেন। এর মধ্যে একজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

কত্তারা জেগে আছেন। আমি এই রাত্রের মতো একটু জায়গা চাই। আঁধারে পথ দেখতে পাচ্ছিনে। ভোর বেলাই চলে যাবো।

বাড়ির লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? উত্তর শুনবার জন্য আমি উৎকর্ণ হলাম।

আমি বাজারের মেয়েমানুষ। তার স্পষ্ট স্বীকৃতির পরিচয় বিদ্রূপ স্ফুলিঙ্গের মতো আজও কানে বাজে।

জানি না সে কেমন দেখতে। তার নিরস, ক্লান্ত খ্যান্‌খেনে ঝাঁঝালো কণ্ঠের পরিচয় সভ্য-সমাজকে ব্যঙ্গ করেছিলো সেদিন।

সভ্য মানুষেরা কেন যে নিজের হাতে এই জাতিটাকে সৃষ্টি করেছিল? কত রকম ব্যাখ্যাই শুনেছি এদের নিয়ে। কিন্তু দেখলাম এরা জাতে মানুষই।

সুন্দরবনের সীমান্তের দাসীর কথা লিখতে গিয়ে অনেক দূর পৌঁছে গেছি।

টেলিগ্রাফের তার বেয়ে-বেয়ে আবার চলে যাই সুন্দরবনে।

সুন্দরবনের শশী বোটম্যান ছিলো নেহাত গুণী লোক। রান্না-বান্না, সুপুরি কুচোনো রুটি-পরেটা, ছেঁই-কাই, নানারকম পিঠে-পুলি,

খাবার-দাবার সে মেয়েদের চেয়ে পরিচ্ছন্নভাবে করতে পারতো। তার হাতের সুন্দর-সুন্দর খাবার অনেক খেয়েছি। তার বাড়ি বাগেরহাটের কাছে জানি কোন গাঁয়ে।

চাঁদপাই আপিসে তিনটে 'ঘু-ঘু ধরা' মোকর্দমা হয়েছিলো ছ'মাস। সুন্দরবন থেকে একটা ঘুঘু ধরলে বে-আইনী। আবার ধানসাগর আপিসে এককাঁদি গোলফল কাটার মোকর্দমা হয়েছিল শুনেছিলাম।

বাবা! আমি কিন্তু একদিন সেই সাত-নদীর মোহানায় অনেক-গুলি বিচিত্রবর্ণের পাতা চুরি করেছিলাম। সুন্দরবন থেকে সে-পাতাগুলি দেশেও এনেছিলাম। রক্ষে টের পায়নি, নইলে জেল হতো নিশ্চিত!

চাঁপাই আপিসে হরিণ মেরে ছ'মাস করে জেল হলো, ছ'-সাত জনের। আসামীরা মাথা মুড়িয়ে ছিলো, যাতে সনাক্ত না করতে পারে। কলকাতা থেকে ব্যারিস্টারও আনিয়েছিলো, তবুও ছ'মাস জেল হলো।

তিনটে ঘুঘু পাখী খায়-দায় খাঁচায় থাকে আর মাসে মাসে মোকর্দমা করতে বাগেরহাট যায়। ঘুঘুর খাবার যা লেগেছিলো ছ'মাস ধরে তাতে একটা ভেড়ার দাম হ'তো।

শশী আমার বাড়ির মধ্যে কাজ করতো। ও আর ঘুঘুর মোকর্দমায় যেতে পেতো না। এমনি এক মোকর্দমায় স্বামী গেলেন বাগেরহাটে।

অনেকদিন আগে স্বামীর অনেক জিনিসের সঙ্গে সরকারী পোষাক চুরি গিয়েছিলো খুলনা থেকে। সেই পোষাকের কোটটা গায়ে দিয়ে আমাদের শশী বোটম্যানের ছোটো ভাই বাগেরহাট বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে। চিনতে পেরে স্বামী তাকে ডাকেন। সে পালিয়ে যায়।

স্বামী তখন পুলিশ নিয়ে শশীর বাড়ি গেলেন। যেয়ে দেখেন তিন পোতায় একঘর। ছোটো একটু সুপুরির পাতার বেড়া দেওয়া কুঁড়ে। চাল আবার তালপাতা ছাওয়া। তারই দাওয়ায় থুরথুরে এক বুড়ো ছেঁড়া কাঁথা মাদুরে শুয়ে আছে। জানা গেলো ওই বৃদ্ধই শশীর পিতা। আর ঘরের মধ্যে আঠারো কুড়ি বছরের একটি মেয়ে কলেরায় অজ্ঞান। ঘর ময় বমি, ভেদ নোংরা কাপড়-চোপড় ময়। তার বুকে একটা বছর খানেকের বাচ্চা দুধ খাচ্ছে।

এই দৃশ্যে স্বামীর তো চোর ধরা মাথায় গেলো। নিজের টাকা দিয়ে বড়ো ডাক্তার, ওষুধ পথ্য আনালেন। আর শশীর ভাইকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে এনে নগদ টাকা, কিছু চাল ডাল কিনে দিয়ে এলেন।

এই হ'লো চোর ধরার প্রায়শ্চিত্ত।

চাঁদপাই আপিসে ছিলো কয়লা-স্টেশন। এখান থেকে অনেক স্টীমার কয়লা নিয়ে যেতো। আবার খুলনা থেকে কয়লা বোঝাই করে স্টীমার রেখে যেতো।

এখানে আসতেন যে সাহেব তাঁর নাম লুইস। খুব বয়স অল্প। তাঁর মেমও আসতেন। আমি বাড়ির মধ্যের জানলা দিয়ে দেখতাম।

আমাদের অনেক মুরগী হাঁস ছিলো। একবার এক টুকরি ডিম দেওয়া হয়েছিলো সাহেবকে। লুইস সাহেব কিছুতেই অমনি নিলেন না। দাম দিয়ে গেলেন।

আবার বসন্ত এলো। পুষ্পাকীর্ণ বনভূমি বিচিত্র পাখির কুজন-মুখর হয়ে উঠলো। ধীরা খড়মা প্রিয় পরশে উচ্ছল, লাস্যময়ী। শিরশিরে বাতাসের দোলা আবার ছড়িয়ে পড়লো। আপিসের আমগাছগুলি আবার বোলে ছেয়ে গেলো।

ফাল্গুন শেষ হয়ে গেলো। কাছারি বাড়ি থেকে নায়েব-গোমস্তারা চলে গেছে।

প্রথম চৈত্রে এলো মাহামারীর বিভীষিকা নিয়ে। খালের ওপারে চিলে গ্রামে কলেরা লেগে গেলো।

সে কী ভয়াবহ দৃশ্য! প্রথমে ছু-একটি, তারপর প্রতি বাড়ি ছু-একজন, তারপর উজাড়।

কোনো ওষুধ, ডাক্তার কবিরাজ কিছু নেই। শুধু এক ভয়ঙ্কর হরিধ্বনি। গ্রামের লোকেরা সবাই মিলে সারা গ্রাম বেড় দিয়ে দিনরাত "হরিব্বোল হরিব্বোল" করে চিৎকার করছে। সেই হরিব্বোল ধ্বনিতে পেটের পিলেও আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

মাঝে-মাঝে হরিব্বোল করতে করতে কাছারির কালীতলায় এসে 'আউত্‌' হয়ে পড়ছে। আউত্‌ মানে অজ্ঞান। রাত্রে বিকট শিঙা বাজিয়ে গ্রাম বেড় দিয়ে ফকির এনে কি মন্ত্রতন্ত্র, বন্ধ-ছন্দ করছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সারাদিনের জমানো মড়াগুলি কাছারির ঘাট থেকে ঝপাং ঝপাং করে খড়মার জলে ফেলছে।

ভয়ে আমাদের ঘুম নেই, খাওয়া নেই।

স্বামী সাহবের কাছে দরখাস্ত করেছেন নদীর জলে কোথাও দূরে ফ্লাট বসিয়ে আপিস করবার জন্য। কলেরার সময়ে অমনি ফ্লাট খুলনা থেকে পাঠায়। উত্তর এসেছে—সাহেব শীঘ্রই আসছেন।

নদীর মাছ খাওয়া বন্ধ। আপিসের গাছের এঁচড়, আমের গুঁটি, ছোলার ডাল খুব খাচ্ছি। গ্রামের গোরুর ছুধ বন্ধ। সরষের তেল মাখিয়ে ভাত রাখি, যাতে মাছি না-বসে। দিন-রাত কর্পূর খাচ্ছি আর শুঁকছি।

সারা গ্রামের মধ্যে আপিসটুকু টলমল করছে। সকালবেলা যে-জোয়ান লোকটিকে দেখলাম, সন্ধ্যায় সে খড়মার জলে।

আপিস ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই। মন শঙ্কাতুর। পালাতে পারলে বাঁচি। কথা হলো, জা-দেবর-আমাকে বাড়ি পাঠানোর। কিন্তু আমরা একজনকে রেখে যেতে রাজি হলাম না।

সাহেব খুলনা থেকে নানারকম ওষুধ পাঠালেন। আর স্বামীকে বদলী করলেন চব্বিশ পরগনার নলগোড়া ফরেস্ট আপিসে।

চৈত্রের শন-শনে হাওয়া খাঁ-খাঁ দুপুরে নদী-বন-প্রান্তরে শ্মশান-উদাস হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে। শব্দ হয় যেন, 'নাই—নাই—নাই'।

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সামান্য খস্-খস্ শব্দটুকুতেও চমকে উঠি। গ্রামময় কান্নার রোল। সে কী মৃত্যু-ভয়ঙ্কর পরিবেশ!

ক'দিন হলো রোগ কম পড়েছে। সারাদিন 'হরিব্বোল' ধ্বনিও আর করে না। তবে সারা রাত শিঙা বাজিয়ে গ্রাম 'বন্ধ' করে এখনও।

মার্চের মধ্যেই সুন্দর বনের ঘরবাড়ি মেরামত হয়। এবার দেরি হয়ে গেছে। মেরামতি কাজ চলছে দূর থেকে বেশী পয়সা দিয়ে লোক এনে।

চৈত্রের একটা উদাস দুপুরে চাঁদপাই ফরেস্ট আপিস থেকে নীরবে বিদায় নিলাম। বড় নীরবে। ঝিমানো গ্রাম পড়ে রইলো পিছনে। নৌকায় ওঠবার সময় চেয়ে দেখলাম চাঁদপাই গ্রামের বহুলোক-বিসর্জিত কাছারির ঘাটটি।—শান্ত। খড়মার ধারা শোকাহত গ্রাম্য বধূটির মতো ওদের বুকে নিয়ে আবার তেমনিই মৃদু স্বাভাবিক স্রোতে বয়ে চলেছে।

বিদায়-ম্লান চৈত্রের উদাস দুপুরে বন-প্রান্তরের মর্মর্ ধ্বনিতে সেদিন শুনেছিলাম স্বজন-হারা পরিজনের বেদনাতুর দীর্ঘশ্বাস।

নলগোড়া রওনা হওয়ার আগে একজন বাঙালী সাহেব এসেছিলেন। পদবী সেন। নলগোড়া আপিস থেকে শ্রীশবাবু স্বামীকে চিঠি দিয়েছিলেন সেন সাহেব তাঁর কী অপরাধে চাকরি নেবে। একমাত্র স্বামী কী উপায়ে জানি বাঁচাতে পারেন, তাই তাঁকে করুণ অনুরোধ।

খুলনায় এসে রেলগাড়িতে চড়লাম। এর আগে কোনোদিন চড়িনি।

আটত্রিশ বছর আগেকার পরিচ্ছন্ন ফুলের ঝাড়, কেয়ারী পাতা-বাহারী সুসজ্জিত স্টেশনগুলি। কোথাও বকুলবীথি ঘন ছায়া পুঞ্জিত প্লাটফর্ম। চ্যুত বকুল সৌগন্ধে মুখরিত। কোথাও চৈতি সবুজ কাঁচা আম-ভরা পল্লবাকীর্ণ ডালগুলি নুইয়ে দুলে সুস্নিগ্ধছায়া ব্যাজন নিরত।

আজকে তার চিহ্নমাত্র নেই। জনবিরল শান্ত মন্থর খুলনা লাইনের স্টেশনগুলি এখন জনাকীর্ণ। বহু বর্ষ আগের কৃষ্ণচূড়া-রক্তিম কলকাতার পথের আর সে মন্থরতা নেই।

ডায়মণ্ডহারবার লাইনে মগরাহাটে নেমে শালতি চড়ে রওনা দিলাম জয়নগর-মজিলপুরের উদ্দেশ্যে। অবশ্য জা-দেওর, যতেকে নামিয়ে দিয়ে এসেছিলাম যশোর স্টেশনে।

সেই 'বাবাদাদু'ওয়ালা যতে চাঁদপাইয়ে মড়কের সময় চুরি করে পুকুর থেকে টেংরা মাছ ধরতে গিয়ে পায়ে কাঁটা ফুটিয়ে বীভৎস রকম পা ফুলিয়ে কাণ্ড করে বসেছিলো। ওর জন্য মনটা বড় আকুলি-বিকুলি করতে লাগলো।

চাঁদপাইয়ের ভাদরিটা মরেছিলো কিনা জানি না। সরলা মিতিন তো শ্বশুরবাড়ি ছিলো। বিদায় মুহূর্তে ওর কথা বড়ো মনে হয়েছিলে।

খানিকটা রাতে জয়নগরে আমার এক মামাশ্বশুরের বাসায় পৌছোলাম। এই মামাশ্বশুরটি সেই খুলনা জেলার ঘাটভোগের কালো মেয়ে শশী মাসীমার স্বামী। শশী মাসীমাকে পরিত্যাগ করে এখানে এসে এক সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে সুখে-স্বচ্ছন্দে আছেন। শ্বশুরবাড়ির দান খুব বড়ো একখানা বাড়ি পেয়েছেন জয়নগরে। বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়েও হয়েছে।

রাত্রি অনেক হয়েছিলো। আমাদের সঙ্গে খাবার ও মিষ্টি ছিলো। তাই দিয়ে রাত্রের খাবারের ব্যবস্থা করা হলো। ওঁরা অবশ্য রান্না-বান্না করতে চাইছিলেন।

পরদিন সকালবেলা খুব রান্না করে খাওয়ালেন মামাশ্বশুর নলিনীমামার মা। বিকেলবেলা ওড়িয়া বেহারার দুখানা পালকিতে রওনা হলাম। দুখানা লাল ও সবুজ রঙের বেশ বড়ো পালকি। নেলে পর্যন্ত যেতে হবে পালকিতে। সেখান থেকে ভাড়াটে নৌকায় নলগোড়া ফরেস্ট আপিসে।

যাবার বেলা নলিনীমামার বৌ কাপড় পাট করে, ফুল কোঁচা করে, পরিচ্ছন্ন মসলা দিয়ে পান সেজে, কালো কুঁজোর ঠাণ্ডা জল দিয়ে পালকিতে তুলে দিলেন।

শশীমাসীমা এলোমেলো, ভোলা-খোলা সেবাপরায়ণা গ্রাম্য মেয়েটি। ওঁর সতিনটি সুচতুরা, আঁট-সাঁট গোছানি, বড় পরিপাটি শহুরে মেয়ে। গায়ে-মাথায় ভুর-ভুরে গন্ধ তেলের সৌগন্ধ। মুখখানি পান-দোক্তা রাঙানো।

পালকিতে চলেছি। কতকাল আগের জয়নগর। সুরকির রাস্তা। গ্যাস বাতি। শহর শহর ভাব। চৈত্রদিনের কত ভারাক্রান্ত আম-

লিচু ঘেরা বাগান। আর মাটির দেওয়ালের ঘরবাড়ি। জয়নগর-মজিলপুরের মাটির দেওয়ালের ঘর নয় শুধু, বাড়ির পাঁচিল পর্যন্ত মাটির সরু সরু খড়ের চালা দেওয়া। সবই মাটির পাঁচিল দেওয়া বাড়ি। চালা-বিহীন মাটির পাঁচিলও দেখেছিলাম নলগোড়ায়। দু'এক বছরের বর্ষায়ও ধুয়ে যায় না। এত সুন্দর মাটি।

বড়ো গরম। জল খেতে খেতে নেলেয় উপস্থিত হলাম। তখন বৈকালীন শান্ত বেলা।

সেখান থেকে ভাড়াটে ডিঙিতে আবার রওনা হলাম। নেলের ওটা ছোটো খালই হবে। ঠিক মনে নেই।

তারপর মণি নদীর পারে নলগোড়া ফরেস্ট আপিসে পৌঁছে গেলাম সন্ধ্যা হয় হয়, সোনালী বেলায়। নলগোড়া আপিস। নিচে সুমধ্যমা লবণাক্ত মণি নদী। নদীতে তখন ভাঁটি। নদীর জল খুব নিচে। আপিসের ডিঙি নামিয়ে কাদার উপর টেনে বোটম্যান নিয়ে গেলো উপরে নৌকা রাখা সড়কে।

আপিসে ছিলেন পেট্রোল অফিসার লক্ষ্মণবাবু। বুড়িগোয়ালিনী আপিসে যিনি-স্বামীর জায়গায় বদলী হয়ে এসেছিলেন। পরদিন লক্ষ্মণবাবু বোধহয় খুলনা জেলায় বেনেখালি ফরেস্ট আপিসে রওনা হলেন।

নলগোড়া ফরেস্ট আপিসের সামনে ভেড়ির রাস্তা। ডাইনে গেছে কঙ্কনদীঘি রায়দীঘির কাছারির দিকে। বামে গেছে বাড়ি-ভাঙার কাছারির রাস্তা।

নলগোড়া আপিসটি তক্তার পাটাতন করা। বাইরে বোটম্যানদের রান্নাঘর। একটা টৈ-টুম্বুর নোনাজলের পুকুর। আপিসের ডাইনে-বামে নদীর ধার দিয়ে, ভেড়ির পাশ দিয়ে ছোটো বন্য গাছ-রেখা চলে গেছে বহুদূরে। বন এখান থেকে বেশ খানিক দূরে। আপিসের

ধারে একটা কাঠ-বাদাম গাছ। আর সারা জায়গায় লঙ্কাক্ষেত, লঙ্কাফুলে ভর্তি। এই আপিসে যিনি বাবু ছিলেন—শ্রীশবাবু, তিনি লঙ্কা পুঁতেছিলেন।

শ্রীশবাবুর চাকরি নিয়ে বিশেষ গণ্ডগোল হয়। খুলনা জেলার ছুতোরখালি ফরেস্ট আপিসে তাঁকে বদলি করেছে। কয়েকদিন মাত্র লক্ষ্মণবাবু ছিলেন। এখানেও শ্রীশবাবু স্বামীকে কি সব লিখে 'দাদা-লক্ষ্মী' করে অনুরোধ করলেন।

বাড়ির মধ্যের মিষ্টি জলের পুকুরের ধারে দু'টো আম গাছে কাঁচা আমে ভরা। দু'টো ডালিম গাছ ভরা ডালিম। আর রান্নাঘরের পিছনে বেশ বড়ো নানা রকম বন্য পাখির বাসা-শোভিত অশ্বত্থ গাছটি। বনটিয়ে, গাংশালিক, পাতিকাক মায়েরা কেউ ডিমে তা দিচ্ছে, কেউ বাচ্চাকে আধার খাওয়াচ্ছে। কোনো মা খাবার সংগ্রহ করতে গেছে দূরে। ছানারা বাসায় বসে চুল-বুল করছে মায়ের প্রতীক্ষায়। বটগাছটি যেন একটি পাখিদের গ্রাম। নির্জন দেশে পাখিদের প্রতিবেশী হ'লাম আমি।

বটগাছের পিছন দিয়ে ধুধু মাঠ, ধান শূন্য, এখান থেকে চলে গেছে বহু দূরে। ওই মাঠের মধ্যে আপিসের আর একটি গোল পুকুর। বেশ সুন্দর দেখতে। এই মাঠের পুকুরের জল কোনো কাজেই আসে না। জন শূন্য স্থানে কেন পুকুর, তাও জানি না।

নলগোড়া ফরেস্ট আপিসটি বড়ো নির্জন। ডাইনে কঙ্কন-দীঘির রাস্তার ওপরে জানি কোন পুরকায়স্থ একখানি ঘর তৈরি করে রেখেছে।

রাস্তার পাশে শূন্য ঘরখানি আমার কাছে বেশ রহস্যময় লাগে। মনে হয় যেন কত বৌ-মেয়েরা ওখানে রান্না, বাটনা-কুটনো করছে। যেন মিষ্টি কলগুঞ্জন,—যেন খাদ্যের সৌরভ পাওয়া যায় সকাল সন্ধ্যায়।

দিনে-দুপুরে পাখিদের অশ্বত্থ গাছটি ও শূন্য বাড়িখানি ছিলো আমার লক্ষ্যের বস্তু। বাড়িখানির বন্ধুরা আমার চোখে ছিলো অদৃশ্য। আর অশ্বত্থ গাছের বাবুই, চড়ুই, কাক, বনটিয়ে, শালিক মা বোন, ভাই, ছেলে-মেয়েরা আমাকে ওদের মধ্যের একজন ধরে নিয়েছিলো। কেউ মাথার উপর দিয়ে উড়তো, কেউ রান্নাঘরের দাওয়া থেকে চালে-ডালে ঠোক্কর দিতো। আবার কেউ হয়তো আমার খাবার সময়ে পাতের ফেলে-দেওয়া উচ্ছিষ্ট ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে নেচে-নেচে সংগ্রহ করতো।

বৈশাখ মাসে গাঙের ধারে লবণাক্ত মাটি কাটতে আসতো বাগ্‌দী-কাওরা মেয়েরা নুন তৈরি করবার জন্য।

ওরা আমার বাড়ির মধ্যে আসতো। গল্প করতো। ওরা কথা বলতো বেশ পরিচ্ছন্ন কলকাতার মতো। তবে 'র'-এর পরিবর্তে 'আ'-'ও' উচ্চারণ করতো। যেমন রামচন্দ্র—আমচন্দ্র, রবিবার—ওবিবার।

নলগোড়া জায়গাটা যেন কলকাতা-কলকাতা ভাব। আমার বেশ ভালো লাগতো। ডাল, চাল, নুন, তেল, মসলা, পাটালী, বাতাসা, মুড়ি-মুড়কি সবতাতে যেন শহরের সুগন্ধ।

একদিন এক কাওরা বুড়ীর কাছে গল্প শুনলাম, আমার ঘরের বাইরে যে খালি ঘরটা পড়ে আছে, ওখানে নাকি ছিলো এক হিন্দুস্থানী চাপরাসী, তার স্ত্রী ও ছোট্ট ছেলে। সেই চাপরাসীটিরও কলেরা হয়েছিলো এই কয়েকদিন আগে চৈত্র মাসে। তারপর চাপরাসী চাঁদপাইয়ের লোকদের মতো বিনা ওষুধে গেলো মরে। তার স্ত্রী কী অসহায় হয়ে গেলো। মরা চাপরাসীকে নাকি ওর স্ত্রী পায়ে দড়ি বেঁধে নদীতে টেনে ফেলে দিলো। কেউ সৎকার করবার লোক হলো না বিদেশ-বিভূঁয়ে। তারপর জানি কোন বাবু বোটম্যানকে দিয়ে ওর দেশের গাড়িতে তুলে দিয়েছিলো।

আহা, বেচারী চাপরাসীর স্ত্রীর অসহায়তা, বিপদের কথা ভেবে ব্যথিত হতাম অনেক সময় !

কাছারির নায়েবদের অনেক সময় নিমন্ত্রণ করা হতো আপিসে। বাড়িভাঙার নায়েবমশাইকে নিমন্ত্রণ করে আমার নিরামিষ রান্না খাওয়ানো হলো। বুড়ো মানুষটি খুব খুশি হয়েছিলেন সেদিন দেশের মতে কাঁচা কলা, উচ্ছে, কাঁটালবিচি, নারকেল সহযোগে সুক্ত খেয়ে।

রায়দীঘির নায়েব ছিলেন বিদ্বান লোক। বয়স অল্প। রাত্রে স্বামীর সঙ্গে খুব গান-বাজনা করতেন। খেয়ে-দেয়ে কাছারি ফিরতেন। সুন্দর-সুন্দর বেল ফুলের মালা আনতেন আমাদের জন্য। নলগোড়ার কাছারিতেও স্বামী মাঝে-মাঝে বেড়াতে যেতেন। অবশ্য দাবা খেলার জন্য। রজনীগন্ধা ফুল আনতেন কাছারি থেকে।

এখানে অনেক বামুন-কায়স্থ বাওয়ালিরাই 'পাস' করতো। ওরা অনেকে ক্ষীরের সন্দেশ, ছানার পুলি, চন্দ্রপুলি, কাঁঠাল, আম দিয়ে যেতো।

শ্রীশবাবুকে স্টীমারে করে তার চাকরির মুণ্ডপাত করবার জন্য নিয়ে এলেন সেন সাহেব। সেই সময়ে কাঁচা লঙ্কাটি পর্যন্ত নিতে ভুললেন না। এঁরা এলে ডিম, ঘি, দুধ দিতে হতো। কোনোদিন একটি পয়সাও দাম দেননি !

শ্রীশবাবুকে নিয়ে সেন সাহেব খুব তোলপাড় করেও কোনো অপরাধ প্রমাণ করতে পারলেন না। সেই থেকে স্বামীর ওপর সেন সাহেবের হলো ভীষণ রাগ। শুধু ছিদ্র অনুসন্ধানে হলেন তৎপর.

শ্রীশবাবু বাড়ির মধ্যে খিঁচুড়ি রান্না করতে করতে স্বামীর হাত নিজের গলার পইতে দিয়ে জড়িয়ে ধরে কী অনুরোধ করলেন।

মাথায় হাত দিয়ে কত আশীর্বাদ করলেন। তারপর হাঁউ-মাউ করে কী কান্না। বুড়ো বামুনের জন্য বড়ো কষ্ট হয়েছিলো সেদিন। সেযাত্রা শ্রীশবাবুর চাকুরি বেঁচে গেলো। কিন্তু কয়েক-মাস পরেই সু্ঁদুর কাঠের চাকি-বেলুন বাড়ি পাঠাবার সময়ে ধরা পড়ে চাকুরি গেলো।

ব্রাহ্মণ বড়ো লোভী ছিলেন।

আর সেন সাহেবের মেমকে দেখতে ঠিক আমাদের গ্রামের মুখ চেপটা চাষী বউয়ের মতন। মেম সেজে 'তক' স্টীমারেই থাকতেন ইনি।

নলগোড়া ফরেস্ট আপিসের পেট্রোলে ছিলেন সেই শরণ-খোলার সীতিকণ্ঠবাবু। কী অপরাধে জানি পেট্রোলে আছেন। প্রায় সময়েই আমাদের কাছে আসতেন। বড়ো আপনার লাগতো ওঁকে।

সীতিকণ্ঠবাবুর স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। তিনি আবার বিয়ে করেছিলেন। ওঁর বাড়ি থেকে যত চিঠিপত্র আসতো নলগোড়া আপিসের ঠিকানায়।

একদিন আমার বড়ো কৌতূহল হলো—ওঁর তরুণী বধূ প্রৌঢ় স্বামীকে কেমন করে চিঠি লেখেন। একদিন একটা চিঠি খুলে পড়লাম। তাতে লেখা, "বড়ছেলে প্রকাশের স্কুলের মাইনে বাকি পড়ায় নাম কাটিয়া দিয়াছে। পিসিমার আতপ চাল ফুরাইয়াছে। গোরুটার দুধ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ছোটো মেয়ে সুকৃতির ম্যালেরিয়া জ্বর হইতেছে।"

সেই থেকে দ্বিতীয় পক্ষের চিঠি আর খুলিনি। প্রতিজ্ঞা করেছি আর খুলব না কোনোদিনও।

সীতিকণ্ঠবাবুর বড়ো বোট নিয়ে আমরা গেলাম পিয়ালি

স্টেশনে। স্বামী যাবেন খুলনায় জামিন-নামা রেজেস্ট্রী করতে। আমি থাকবো কলকাতায়।

মায়াবিবি হাট থেকে ঝাঁকা ভর্তি বাজার, মেঠে ভর্তি মিষ্টিজল নিয়ে, বড়ো ভাঙান মাছ নিয়ে চলেছি পিয়ালিতে।

বর্ষা নেমেছে। বনশ্রী শ্যামস্নিগ্ধ। বর্ষা-উচ্ছ্বসিত ঘোলা নদী। এপার-ওপার বর্ষার মাতন-লাগা। বনে শুধু সর-সর শব্দ।

পথে যেতে জটার মন্দির দেখলাম। খুব উঁচু। মনে হয় যেন খুব নিকটে, যত যাই ততো দূরে সরে যায়। কত লোকের গোয়ালের গোবর মাড়িয়ে, বিলের জল ঠেলে, জোঁকের কামড় খেয়ে পৌছলাম জটার মন্দিরে। জটার মন্দির বিলের মধ্যে উঁচু জায়গায় অবস্থিত। ওখানে নাকি বুদ্ধদেব উপাসনা করতেন। উপরে নাকি 'অহিংসা পরম ধর্ম' লেখা আছে।

যজ্ঞডুমুর, শ্রীফল গাছে ঘেরা সুউচ্চ নির্জন মন্দিরটি দেবালয় বলে মনে হয়। মন্দিরের বাইরে একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে। অদৃশ্য ফুল-চন্দনের একটা সৌরভ পাওয়া যায়। হয়তো মনের ভ্রম। কতগুলো নীল কুমুদ ফুলের মালা পড়ে আছে মন্দির প্রাঙ্গণে। হয়তো কোনো কৃষকবালার সাদর-গ্রন্থিত। একটা ঠাণ্ডা জলজ সুগন্ধ ছড়িয়ে আছে মালাগুলিতে।

মন্দিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে চূড়ার দিকে গুলী করা হলো বন্দুক দিয়ে। কতগুলো মরা চামচিকে এসে পড়লো।

আমাদের বোটখানি বেশ সুন্দর। খেয়ে-নেয়ে ছাতে চড়ে বেশ আনন্দে চলেছি। বাথরুম, ভাঁড়ার, শোবার খাট-পালঙ্কও বাদ যায়নি।

একদিন দুপুরবেলা খেয়ে ঘুমুচ্ছি খাটে শুয়ে। হঠাৎ কি হয়ে

গেলো। জেগে দেখি আমি বোটের মেঝেয় পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছি। চল্‌কা-চল্‌কা নদীর ঘোলা জল এসে পড়ছে আমার গায়ে। কোনো রকমে টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ালুম।

সে কী কাণ্ড। যেন ভূমিকম্প। একবার উঠে দাঁড়াতে যাই, আর দুম করে পড়ে গড়াগড়ি খাই। সে কী বিপদ! মরণ-দোলন দুলছে বোটখানা। একবার জলের তলে যাচ্ছে, একবার ওপরে ভেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে কিছু বুঝবার উপায় নেই। জানলার খড়খড়িগুলো ধরতে-ধরতে কোনো রকমে আমার কামরার দরজা খুলে যে-দৃশ্য দেখলাম সে অভিনব!

বোটের সামনের গলুইয়ের জায়গায় প্রাণ-পণ শক্তিতে ছ'জন বোটম্যান দাঁড় টানছে, আর নদীর আড়-ঢেউয়ে আমাদের জ্বালানী কাঠ, মাদুর, মাটির কলসী, বৈঠা সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি তো ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। ওপর থেকে মাঝির সাড়া পেলাম। কান্ত বলল ভয় নেই, মা, এই বাঁক ফিরে গেলো বলে। স্বামীও ওপর থেকে অভয় দিলেন। কিন্তু আমি নির্ভয় হ'তে পারলাম না। আর খানিকটা আছড়া-পিছড়া খেয়ে বোট নোঙর করলো পিয়ালি স্টেশনের নিচে।

ব্যাপারটা শুনলাম এই: আড়-ঢেউয়ে স্বামী কেরামতি করে হাল ধরতে গিয়েছিলেন। মাঝে-মাঝে অবশ্য তাঁর একটু-আধটু অভ্যাস ছিলো। আজকের কাণ্ডটা বড়ো গুরুতর। বর্ষার উচ্ছ্বসিত-তরঙ্গায়িত বিদ্যাধরী ফুঁসে উঠেছিলো।

তখনকার স্বস্তির কলকাতায় কয়েকদিন ঘুরে ফিরে, দেখে শুনে আবার ফিরলাম সুন্দরবনে।

যে বিদ্যাধরী নদীতে এই কাণ্ড হয়েছিলো একদিন, তাকে চৌত্রিশ বছর পরে সেদিন আবার দেখলাম ঘুটিয়ারি শেরিফ যেতে।

পিয়ালি স্টেশনটি ঠিক তেমনিই আছে। কিন্তু যৌবনোচ্ছলা বিদ্যাধরীর কোনো চিহ্নই নেই! যেখানে আমাদের বোট নোঙর করা হয়েছিলো, সেখানে জলের চিহ্ন নেই। লম্বা সড়কের মতো, কিছু পায়ের দাগ চলে গেছে। হয়তো বর্ষায় জল বেধেছিলো।

নলগোড়ায় ফিরে দেখলাম বাড়ির মধ্যে বেশ জঙ্গল হয়েছে। পুঁইলতাগুলি সব মাটির পাঁচিলের চালায় ছড়িয়েছে। নলগোড়ার বাড়ির মধ্যে ছিলো পাঁচিল, মাটির ঘেরা। ঘরটা কাঠের পাটাতন করা। পুনর্ণবা শাক, লঙ্কা প্রচুর হয়েছে। পাকুড় গাছটার গোড়ায় রান্নাঘরের পেছনের ছোটো ডালিম গাছটায় বড়ো-বড়ো ডালিমগুলি খুব বড়ো, লাল হয়ে গেছে।

আমাদের রান্নার লোক ছিলো। তার নাম দেবেন। তার একটি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিলো। কোনো পুকুরে যদি একটি মাছও থাকতো, তার হাতে নিস্তার ছিলো না। গরম দিনে খুব বড়ো-বড়ো বেলে মাছ, কৈ মাছ ধরতো মিষ্টি জলের পুকুর থেকে। মাছগুলি পালিয়ে থাকতো ভাঙা ডিঙির মধ্যে। ঐ দেবেন বাগের-হাটে খাঞ্জালীর দীঘিতে পর্যন্ত পাকা সিঙিমাছ ধরেছিলো।

শ্রাবণের বর্ষায় বাঁলতি কেটে কেটে ডিমভরা, মৌরলা, পুঁটি মাছ ধরলো দেবেন। বর্ষার সঙ্গে দমকা বাতাস হলে নদীতেও প্রচুর নোনা চিংড়ি পাওয়া যেতো। বর্ষায় খুব মধুর পায়স খাওয়া হতো নলগোড়ায়। গরম মধুতে গা জ্বালা করে, বর্ষায় দেহ গরম রাখে।

নলগোড়া ফরেস্ট আপিসে খুব ভালো শুকনো আখের গুড়ের পাটালি পাওয়া যেতো। নদীর ধার দিয়ে অনেক বাগ্‌দী মেয়েরা বর্ষায় বঁড়শী ও হাত জাল দিয়ে বড়ো-বড়ো কাঁকড়া ধরতো, হাত-জালে তাকে ছেঁকে তুলতো।

বিলের জলেও হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, পায়ে মল পরা বাগ্‌দী

মেয়েরা ছেঁকনি-জালে কুচো-কাচা মাছ ধরতো। পিছনে থাকতো তাদের নেংটা কাদা-মাখা ছেলে খালুই হাতে।

বর্ষার সঙ্গে এখানে সাপের অত্যাচারও বেড়ে গেলো খুব। জড়া জুড়ি করে দু'তিনটে সাপেরা কসরত দেখাতো। হয়তো উঠেই গেলেন আমার রান্নাঘরের দাওয়ায়! লম্বাও তারা হাত পাঁচেকের কম নয়। আমি ভয়ে আড়ষ্ট।

পাখিদের গ্রাম পাকুড়গাছটার ওপর সাপদের খুব নজর। ডিম, বাচ্চাগুলি সব মনের সাধে খেতে শুরু করেছে। আমি পাটাতনের ঘরের দাওয়া থেকে কাঠবাদাম ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিনরাত সাপ তাড়াই। তবু ফাঁক পেলে ছানাগুলি আস্ত গিলে খায়। আর পাখির মায়েরা কি ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি আকুলি-বিকুলি করে! আমার বড়ো কষ্ট হয়।

কিন্তু আমারও যে ভয় করে খুব ওই লম্বা সাপগুলোকে! আমার ঘরটা উঁচু বলে যা আসে না। আবার গাছেও তো চড়তে জানে বেশ! সন্ধ্যে হলে আর নিচে নামবার উপায় নেই। ছোটো সাপ সারা উঠোনটায় কিল-বিল, হিল-হিল করছে।

পুকুরটার জলে জলগেঁটে না কি বলে, ছোটো-ছোটো সাপ আর জোঁক বিল-বিল। একদিন বিশেষ কাজে পুকুরে নেমেছিলাম দু'তিন মিনিটের জন্য। তাইতে তেরোটা জোঁক লেগেছিলো আমার গায়ে।

খোলা মাঠ। নদীর হাওয়ায় সব সময় যেন ঝড় বয়। সঙ্গে বৃষ্টি থাকলে তো কথাই নেই। সোনায় সোহাগা।

'একদিন অমনি ঝড়-বাদলে দুপুরবেলা রান্না প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে; স্বামী ছুটতে-ছুটতে এসে বললেন, তোমার তরকারি, ডালগুলি নাও তো। এসো, এসো—

আমি তো অবাক্। দিন-তুপুরে বাবুর বউ কোথায়ও যায় নাকি? তবুও ওঁর পেছন-পেছন ডাল তরকারির গামলা, থালা নিয়ে চলেছি।

গিয়ে দেখি আপিসের উঁচু পাটাতনের তলায় জন পনেরো বাওয়ালি। পাটাতনের তলে গর্ত খুঁড়ে শুধু চাট্টি ভাত রান্না করে কলাপাতায় ঢেলে তুটি তুটি খাচ্ছে। ওঁর কাছে চেয়েছিলো একটু নুন।

তাই এই কাণ্ড।

সত্যই সেদিন আমার সব তরকারিগুলি সার্থক হয়েছিলো। ঝড়ের তুপুরে কী খুশি হয়েই খেয়েছিলো ওরা আমার ডাল-তরকারি। আমিও খুশি হয়েছিলাম বড় কম নয়।

নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ করে খাইয়েছি জীবনে অনেক ভদ্র ব্যক্তিকে, কিন্তু এমন আন্তরিক খুশি দেখিনি কোনোদিন। কী কষ্ট করে ওরা বন-বাদাতে কাঠ কাটে, মধু ভাঙে।

নলগোড়া আপিসে নদীর বা বর্ষার জল ওঠে না। তাই জল বর্ষায় অনেক বাওয়ালিই পাটাতনের তলায় রান্না করে খায়। তরকারি ওরা কোনোদ্দিনই রাঁধে না। খাগ্য লঙ্কা-পোড়া, পেঁয়াজ-পোড়ার উপরে কিছুই নেই।

দেবেন ওদের মাঝে মাঝে মাছের তরকারি না-খাইয়ে ছাড়তো না। দেবেন মাছ ধরতে যেমন জানতো, রান্নাটিও ছিলো তেমনি ভালো। কেবল বুদ্ধি বোধহয় ওজনে একটু কম ছিলো।

দেবেন গেলো কয়েকদিনের ছুটিতে বাড়ি। অবশ্য ও আমাদের দেশেরই মানুষ। ওর জায়গায় কোন গ্রাম থেকে এক বৈষ্ণবীকে এনে রেখে গেলো।

বৈরাগী মেয়েটি অলক-তিলক কাটা শান্তশ্রী। বয়স পঞ্চাশের ওপর। বৈষ্ণবী কাজগুলি বেশ পরিচ্ছন্ন করে। আমি ওকে

তিনবেলা পেট ভরে মাছ, ভাত, দুধ খাওয়াই ; আর রোজই খাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করি, ওর খেয়ে পেট ভরেছে কিনা। ও সম্মতি জানায়।

একদিন জানি কোন বোটম্যানকে কি খাবার দিচ্ছিলাম। সে আমাকে বললো, মা আপনি আমাদের এত যত্ন করে খাওয়ান, বৈরাগী বুড়ীকে কেন পেট ভ'রে খেতে দেন না ?

আকাশ থেকে পড়ার মতো আশ্চর্য হলাম। রাগ যা হলো বুড়ীর ওপর ! এত মরণ গেলোন দিয়েও এত মিথ্যা কথা কী করে বললো ? ও নাকি ওদের কাছে বলেছে, আমি যে খাবার দিই তাতে ওর পেট ভরে না।

আচ্ছা। আমি আর কিছুই বললাম না।

তার পরদিন দুপুরবেলা হাঁড়িখানেক ভাত, এক গামলা ডাল, মাছভাজা, তরকারি ওকে ঢেলে দিলাম। কী আশ্চর্য, ও অনেকক্ষণ ধরে বসে-বসে সব খেয়ে ফেললো !

সেইদিন সন্ধ্যায় ও শুয়ে থাকলো। রাত্রে খেতে ডাকলে কিছুই খেলো না। তার পরদিন সকালেও কিছু খেলো না। তখন আমি দু'চার কথা শুনিয়ে বললাম, খেতে পারো না, তবু নিন্দে করা চাই।

ও বললো, আমি অমনই খাই।

আমি বললাম, একবারে একহাঁড়ি গেলো ! আর সারাদিন জলটুকুও খাও না ?

ও বললো, আমি সারাদিন ভিক্ষে করি, বিকেলবেলা রান্না করে একবারে পেট ভরে খাই, মা।

বুঝলাম অভ্যাসে মানুষ সব কিছুই পারে।

আমার ও স্বামীর এক সঙ্গে ফোটো ছিলো একটা। একদিন বৈষ্ণবীকে স্বামী জিজ্ঞেস করলেন, বলতো এ কার ফোটো ?

ও উত্তর দিলো, নবদ্বীপের কালাদাস বাবাজী আর তাঁর সেবাদাসী!

ওর চোখেই ও দেখেছিলো!

কুড়ি বাইশ দিন পরে দেবেন দেশ থেকে এলো। বৈষ্ণবী চলে গেলো।

নিরীহ শান্ত মানুষটির জন্য সেদিন বড়ো বেদনা অনুভব করেছিলাম। সান্ত্বনা পেয়েছিলাম ওর স্বাস্থ্যটি দেখে। একা মানুষটি, হয় তো কোনোদিন স্বস্তি হয়ে বসে দুটো খেতে পায়নি। বড়ো রোগা ছিলো ও।

নলগোড়ার নির্জনতা আমার আর ভালো লাগছিলো না মোটেই। কোথায় কোন দূরে মানুষ আছে, দেখতে পাইনে ছাই।

শরতের আকাশ-বাতাসে যখন পুলকোচ্ছ্বাস, ভাদ্রের নদী-প্রান্তরের যখন মেশা-মেশি, হাওয়ায় মন-মাতানো আমেজ, তখন নলগোড়া ছেড়ে ফিরলাম, যে-পথে এসেছিলাম সেই পথে।

ফিরবার পথ নেলো থেকে আরম্ভ করে মগরাহাট পর্যন্ত ডুবে জলময় হয়ে গেছে। একটি ধানের গাছও আর বেঁচে নেই। ভেসে-যাওয়া জল-সমুদ্রের মধ্যে গ্রামগুলি যেন দ্বীপ। গ্রামের লোকেরা পারাপার হয় এ-বাড়ি ও-বাড়ির মধ্যে বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে।

শালতি চড়ে আখঝোপের মধ্য দিয়ে কতো নাল-সাপলা ভরা ভেসে-যাওয়া পুকুরের উপর দিয়ে শিরশিরে বাতাসের দোলা গায়ে জড়িয়ে ট্রেনে উঠলাম আবার মগরাহাটে।

আবার কপোতাক্ষী

একটি জ্যৈষ্ঠের শেষ রাত্রে টেঁকার খেয়া গোরুর গাড়ি সমেত পেরিয়ে আবার চলেছি সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে।

বারান্দী গ্রামের আমবাগানের মধ্য দিয়ে পদ্মপুকুরের পাশ দিয়ে মেঠো রাস্তা বেয়ে ট্রেন ধরলাম নওয়াপাড়া স্টেশনে।

রূপসী বেয়ে কতো মাঠ-ঘাট-বন-প্রান্তর পেরিয়ে বড়দলের বাজার ডাইনে ফেলে, চাঁদখালির স্টীমারঘাটের নিচে দিয়ে পৌঁছলাম আবার কপোতাক্ষী ফরেস্ট আপিসে।

কপোতাক্ষী সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় আপিস। এবার এখানে ছিলেন মামাশ্বশুরের বন্ধু, খুলনা জেলার সতিনসে গ্রামের ভূপালচন্দ্র তরফদার।

ভূপালবাবুর একটা হরিণের বাচ্চা ছিলো। সে নিশ্বাসের শব্দ পেলেও পালিয়ে যেতো। এতো সর্তক। আর ছিলো ওঁর মেয়ে বিশালাক্ষী। আমার বিশা ঠাকুরঝি। ভারি ভাব হয়েছিলো দুজনে।

সেবার মাত্র কয়েকটি দিন ছিলাম কবতক্ষে। কিন্তু এবার দেখেছিলাম সুন্দরবনের একটি শ্মশান-রুক্ষ দুর্ভিক্ষের মূর্তি।

সে কী করুণ দৃশ্য। তেপান্তর মাঠ। কোনো ফলের গাছ নেই। কোনো একটি সবজীক্ষেত নেই। লবণাক্ত নদীর পারে ধানক্ষেতের মধ্যে কৃষকদের গ্রাম। নোনায় সব ধান নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু পড়ে আছে ধুধু রিক্ত মাঠ।

ধান ওদের সব। বিচালী ওদের ঘরের চালা, গোরুর খাবার। ধান ওদের ভাত, কাপড়—সবকিছু।

গ্রামের বুভুক্ষু নারী-পুরুষ বেড়ে থাকতো ফরেস্ট আপিসটিকে।

ফরেস্ট আপিসের মানুষগুলো ভাত খায়। ওদের আশা একটু ফ্যান। ক'খানা আমের খোসা, হয়তো কিছু চিঁড়ের কুঁড়ো। যদি একমুঠি ভাত মিলে যায়, তাই দলে-দলে ভিড়।

অতো লোক, কতোটুকু সাহায্য পেতে পারে একটা ফরেস্ট আপিস থেকে।—তবু কিছু পায়।

ওদের সম্পত্তি—চরের ঘাস খেয়ে কোনোরকমে বাঁচা। ওদের গোরুর দুধ, মাঠের কচ্ছপ। তাও দুধের সের এক আনা, একটি কচ্ছপের দাম এক আনা। আর কতোই বা কিনতে পারে ফরেস্ট আপিসের লোকেরা।

তবু ভিড়। অর্ধ উলঙ্গ, রুক্ষকেশী দীর্ঘাঙ্গী কৃষাণীদের খিন্ন দেহ। আলো-হাওয়ায় গড়া শক্ত বলিষ্ঠ হাত-পা এখন অনাহারে শিরাবহুল। পরনে কাপড়, মাথায় তেল নেই। শুধু কুকুরের বভুক্ষু দৃষ্টি নিয়ে ওরা ঘুরে বেড়ায়।

বন প্রদেশে নোনা জলের ধারে ধুধু মাঠের বাসিন্দাদের শুকনো মরু দুর্ভিক্ষ-পোড়া অবস্থা দেখে কয়েকদিন পরে আবার একদিন যেন অপরাধীর মতো যাত্রা করলাম বাড়ির উদ্দেশে।

শুনেছিলাম সুন্দরবনের খানিকটা মানুষের পেটের আগুনে ঝলসে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে।

দুর্ভিক্ষের আগুন থেকে কুড়িয়ে আমরা একটি ছেলেকে সঙ্গে এনেছিলাম। ছেলেটির নাম পার্বতী। পার্বতী আমাদের দেশে এসে ভাতের সঙ্গে বাড়ি-বাড়ি পাকা কাঁঠালের প্রাচুর্য দেখে একরকম পাগল হয়ে গিয়েছিলো।

স্বামী সেলিংকুপে বদলী হওয়ায় আমার আর অনেক দিন সুন্দরবনে যাওয়া হয়নি। একদিন একটি সুন্দর পৌষ-বেলায় রওনা হলাম গ্রাম্যপথ বেয়ে ঘোড়ারগাড়ি চ'ড়ে সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে।

পথে-পথে তখন নতুন ধানের গন্ধ। দু'পাশে সজনেফুল, আমের বোল, কুল-ভরাক্রান্ত গাছ। পথের দু'ধার দিয়ে টানা রৌদ্রে লঙ্কা-বেগুন, মটর-খেসারি, সোনার ফুলে ভরা সরষে ক্ষেত। আম্রমুকুলে, সজনে ফুলে, ভ্রমর গুঞ্জন। শাদা বাসক পুষ্পগুলি মধু-পূর্ণ। পাথরকুচি মঞ্জরীও টস্‌টসে্‌ মধুভরা। আর পথে, মাঠে, বাতাসে খেজুররস জ্বালানো মধুগন্ধ। আমরাও চলেছি ধীরে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে মধু অপরাহ্ণে।

অনেক রাত্রি হলো যশোর পেঁাছোতে। কী ভীষণ শীত যশোরে। সেদিনটি চলে গেছে কিন্তু যশোরের মাঝ রাতের শীত আজও ভুলিনি। রাত দু'টোর গাড়িতে আমরা খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

ট্রেনে উঠে তবে আমার জ্ঞান হয়। ভোর রাতে খুলনা স্টেশনে অমনি অবস্থা। বাঁচলাম সুন্দরবনের ছোট ডাক-স্টীমারে উঠে। স্টীমারে একটিমাত্র কেবিন, আমাকে ছেড়ে দিলো। ছোট্ট স্টীমার-খানি দুলে-দুলে চলতে শুরু করলো। দূরে আবছা হয়ে মিলিয়ে গেলো খুলনা শহর। শীতে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলাম যে কতোক্ষণ! যখন উঠলাম বেলা তখন অনেক।

বড় বড় নদী, জলো-হাওয়ায় বাতাসে শুধু শীত। সারাদিন ধরে স্টীমারখানি সাঁতারু খরপুন্ন মাছটির মতো ভেসে চলেছে। কতো

মাঠ-ঘাট, প্রান্তর, বনরেখা পেছনে রেখে চলেছি। সামনে শুধু অকূল জল।

বিকাল থেকে স্টীমারটি আপিসে-আপিসে বাজার, ডাক দিতে শুরু করলো। সন্ধ্যার আগে পৌঁছলাম পশোর-নদীর পারে ঢাংমারী ফরেস্ট আপিসে। পশোর এত বড় নদী এপারে থেকে ওপার দেখাই যায় না।

রাত এগারোটায় ডাক-স্টীমার আমায় নামিয়ে দিলো ফিউয়েল-কুপের ফ্লাটে। সেখান থেকে ডিঙিতে রওনা হলাম আমার গন্তব্য স্থান ধানসাগর ফরেস্ট আপিসের উদ্দেশ্যে।

রাত বারোটায় খোলা ডিঙিতে শীতে কাঁপতে-কাঁপতে আপিসে পৌঁছলাম।

ধানসাগর আপিসটি মরা-ভোলা নদীর উপর। ভোলা এখানে তেমন চওড়া নয়। ওপারে গাঢ়সবুজ ঘন সজ্জিত বন। এপারে ধানসাগর গ্রাম, আপিস, ধুধু মাঠ তখন ধান শূন্য।

এ-আপিসও তেমনি তক্তার পাঠলাজ করা। খুব উঁচু। মাত্র তু'কামরা। সামনের কামরায় আপিস, একটি বারান্দা। পেছনের কামরায় বাবুর কোয়ার্টার। পুকুর-ঘেরা বাড়ির মধ্যে অনেক জায়গা। তু'খানা উঠোন। রান্নাঘর মাটির পোতা। আপিস-সংলগ্ন ঘর থেকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। বাইরে বোটম্যান, চাপরাসীর ঘর।

চাপরাসীর নাম বিজয় দত্ত। মাঝি আছিরদ্দি প্রৌঢ়, বুদ্ধিমান। বাড়ি আপিসের পেছনে, ফাঁকা মাঠের মধ্যে। বোটম্যান মহম্মদ, মেছের আর যাদব।

যাদব আমাদের কাজ করে। বয়স কুড়ি-বাইশের মধ্যে। পেট-মোটা পিলে-রোগা। রোজ তার ম্যালেরিয়া জ্বর আসে।

সারাদিন না-খেয়ে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে থাকে। অনেক রাত্রে জ্বর ছেড়ে গেলে এক কড়াই মাছ ভাজা, এক হাঁড়ি ভাত খায়। অবশ্য খাওয়া নিয়ে ওকে কেউ কিছুই বলে না।

আমরা ওখানে গেলে পরের দিন সকালে একটা লোক দেখা করতে এলো। ছেলের হাতে এক বাটি দুধ, একটি লাউ। লোকটি রোগা রোগা, বুড়ো। মুখে দাড়ি। নাম শের আলি। শুনলাম ধানসাগর গ্রামের একজন মাতব্বর সম্পন্ন ব্যক্তি। বহু বিঘে ধানী জমি, অনেক গোরু, দুটো পুকুর মায় টিনের দোতলা বাড়ি, নগদ টাকাও যথেষ্ট আছে। আর আছে সুস্থ, সবল আটটি ছেলে। অবশ্য তার একটি ছেলে তার নিজের ভাই সোনামদ্দিকে পৌষ্যপুত্র দিয়েছে।

লোকটিকে আমার বেশ লাগলো। বেশ লেখা-পড়া জানে বলেই বোধ হলো। বড়ো বিনয়ী, মিষ্টভাষী। স্বামীর সঙ্গে অনেক কথাই বললো। আমাদের সুবিধা-অসুবিধা জানাতে বার বার অনুরোধ করলো। আর নেপথ্য থেকে যাবার বেলায় বলে গেলো তার বাড়িতে অনেক খেজুর গাছ—মা ঠাকরুণ যেন যখন ইচ্ছা যাদবকে পাঠিয়ে রস-গুড় এনে খান। অবশ্য ছেলেদের দিয়ে সে পাঠাবে।

সে খেজুর রস, গুড়, দুধ, যথেষ্ট ডাব, পুকুরের রুইমাছ পাঠাতে ভোলেনি।

আমাদের আপিসের যথেষ্ট মাছ, হরিণের মাংস ও শের আলিকে দেওয়া হতো।

শের আলির নামে অনেক কথাই শুনলাম। ও যৌবন কালে নাকি ডাকাতের সর্দার ছিলো। বহু লোকের ধানের নৌকা ও নাকি লুট করেছে। বহু লোকের প্রাণসংহার করেছে।

আমি কিন্তু ভেবে পেলাম না, অতো ক্ষীণদেহী, বিনয়ী, মিষ্টভাষী

লোকটি কি করে ডাকাত ছিলো। বাবার বয়সী, বাবার মতো দাড়ি মুখে, শের আলিকে আমার ভালোই লাগলো।

সারারাত ধরে জেলেরা নৌকা দেখিয়ে মাছ ফেলে দিয়ে যায় আপিসের ভিতর। সকালে সেই একঘর মাছ গ্রামের লোকদের বিলোনো হয়। আপিসের লোকেরাও দু'চারটে খায়। জেলেরা যে মাছ দেয় তার বেশির ভাগ শেওলা-পড়া খুব বড়ো গলদা চিংড়ি, প্রচুর কুলকে টেংরা, রুই, ইলিশ। আর এক রকম, এক কাঁটা-ওয়ালা কৈ-বোল মাছ। তার গলা দিয়ে দু'টো নলের মতো হাতা। খুব বড়ো-বড়ো শোল মাছও পাওয়া যায়।

আমরা ধানসাগর যাওয়ার কয়েকদিন পরেই এক তুমুল কাণ্ড। —আপিসের জেটির নিচে নদীর মধ্যে ঘ্যাঁক্, ঘ্যাঁক্ ঘ্যাঁকর ঘ্যাঁক্!

এ শব্দের সঙ্গে আমি বিশেষ পরিচিত। সুন্দরবনের সাহেবদের স্টীমারের এমনি কুমির ডাক হুইসেল। আর এতো আসল কুমিরের ডাক। চার-পাঁচটা কুমির মিলে ভীষণ যুদ্ধ করছে সন্ধ্যাবেলা। আমি তো ভয়ে আড়ষ্ট।

শুনলাম, বহুকাল থেকে এক কুমির দম্পতি এখানে বাস করে। কুমিরনী লোকটা বড়ো ঝগড়াটে। নাতি-নাতিন, ছেলে-মেয়ে, স্বামীর সঙ্গে মোটে বনিবনাও নেই। সারাদিন খেটে-খুটে কুমিরনীর রাগ চড়ে যায়, তাই তুমুল যুদ্ধ করে সারা রাত ধরে। ভয়ে আমার ঘুম হয় না।

যে চড়া-পড়া জায়গাটায় কুমিরদের রাতে যুদ্ধ হয়, সকালবেলা মহিষরা তাদের ছানাপোনা নিয়ে সেখানে জোয়ারী জলে গা এলিয়ে সাঁতার কাটে। অবাক্ হয়ে যাই।

শুনলাম, ওদের বাচ্চা যদি কুমিরে ধরে—যেখানে পালিয়ে থাকুন-না-কেন সেখান থেকে মহিষের মা শিং দিয়ে গুঁতিয়ে তার বাচ্চা কেড়ে নিয়ে কুমিরের পেট চিরে শেষ করে দেয়।

মরা ভোলার ওপারে সবুজ, সুশ্যাম বনশ্রেণীর মধ্য দিয়ে স্বর্ণ-বর্তুল বালসূর্য ভেসে ওঠে। প্রভাতী সোনার আলো ছড়িয়ে পড়ে ভোলার বুকে, আবার দিনান্তে স্বর্ণগোলক ডুবে যায় সবুজ সমুদ্রে।

সূর্যাস্তের রক্তিমাভা মেশা বনের ছায়া নদীর বুকে কুহকী মায়া রচনা করে।

নদীর পারে সবুজ বনের মাথায় যখন সূর্য ওঠে আবার ডুবে যায় সে এক দেখবার জিনিস। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন নদী-বন-প্রান্তর একসা হয়ে যায়। কোথাও কিছু দেখা যায় না। কুয়াশার জল ঝরে পড়ে। খুদে বেঁড়ে পোকারা কামড়াতে শুরু করে।

এখানে আমার একজন সঙ্গী ছিলো, আপিসের সাদায়-কালোয় কুকুর ভুলু। ও দিন-রাত রান্নাঘরের ছাঁচতলায় ঘুমায়। ওকে আমার খাবারের ভাগ দিই। ও সামান্যতেই আমাকে বড়ো ভালোবাসে।

এখানে বড়ো একটা কেউ আসে না। প্রায়ই একাই থাকি। মিঠেপুরের যাদব তো প্রায় সময় জ্বরে অজ্ঞান হয়ে থাকে। এখানে কোনো ডাক্তার আনতে গেলে সেই মোরেলগঞ্জ। তবে আপিসে সামান্য কিছু ওষুধ থাকে।

সে ওষুধ খেয়ে কোনো ফলই হচ্ছে না। অনেক দিন ভুগে ওর বড়ো লোভ হয়েছে। যা-তা খায়। একদিন কোনো গুণিনের কাছ থেকে মন্ত্র-পড়া একটা মোচা নিয়ে এলো। মোচাটির সর্বাঙ্গে খেজুরকাঁটা ফোঁড়া। ওতে নাকি ওর পিলে ফোঁড়া হয়ে গেছে। মোচাটি দিলো আমার উনুনের উপর টাঙিয়ে। মোচা নাকি যতো শুকুবে ওর পিলে ততো শুকুবে।

মোচা অবশ্য শুকুলো, কিন্তু ওর ধামার মতো পেট একটুও কমলো না।

দক্ষিণে দেখতে পাই আপিসের ঘাট, বাওয়ালিদের নৌকা।

ওপারে বিস্তারিত সবুজ গালিচার মতো দিগন্তহারা সুন্দরবন। আর মাঝখানে উদাসী নদী ভোলা, ঘোলা লোনা জলের প্রবাহ। উত্তরে আছিরদ্দি মাঝির বাড়ি খোলা মাঠের মধ্যে। মেয়েরা টিনে করে ধান ভাবায়। হাত নাড়া করে শুকোয়, ধান ভানে। ওদের কথার একটু শব্দ শুনতে পাইনে। কেমন নীরবে সবক্ষণ কাজ করে চলে মেয়েরা।

পৌষমাস যায়-যায়। মহম্মদ আর মেছের বোটম্যান আমার পিছনে লেগেছে—মা, আমাদের পৌষ-পার্বণের পিঠে করে দিতে হবে। হতভাগা দু'টো মায়ের কাছে খালি অবদার করছে! মায়ের যে ক্ষমতা কতটুকু সে তো ওরা জানে না।

শের আলির বাড়ি থেকে রস এনে জ্বাল দিয়ে রাখছে। মোরেল-গঞ্জ থেকে বড় বড় নারকেল এনে রেখেছে পনেরো দিন আগে। আর দিন রাত আছিরদ্দি মাঝির বাড়ি ঢিপ-ঢিপ করে ঢেঁকি পেড়ে চাল কুটছে। মন খানেক হবে। আবার দুধও বায়না করে রেখেছে আধমণ খানেক। স্বামীও মাঝে ফুলকুড়ি দিচ্ছেন, পিঠে দু'তিন রকম করে ওদের খাওয়াও। মরণ! আমি যে এক রকমও করতে পারি না, সে তো কেউ বোঝে না! আমাকে আঠারো বছরের পাকা গৃহিণী ভেবে বসে আছে সবাই। কী করবো, নিরুপায়। একটা কিছু করতেই হবে। দিন আগত। মহম্মদের তো জিভে লালা ঝরছে।

আমি কতো কামনা করলাম জ্বর হবার জন্য। কতোবার ঠাণ্ডা জলে গা ধুয়ে স্নান করলাম। কিন্তু জ্বর কিছুতেই এলো না।

আমাকে দিয়ে পিঠে ওরা করাবেই। খাবার লোকও বেশ যোগাড় করেছে—দশ থেকে বারোর মধ্যে। পিঠে যেন আমি কতো করেছি। শুধুই তো খেয়েছি। নবমী পুজোর পাঁঠা ছাড়া

আমার দুঃখ কেউ বুঝবে না। সব আপিসেই ছিলাম কিন্তু এমন রাক্ষসদের পাল্লায় পড়িনি কোন দিন।

মহম্মদটা শান্ত, তবু লোভ। মেছেরটা নর-রাক্ষস। ওর সব মেলা-মেলা। একটুতে ওর হয় না। পিলে রোগা যাদবটাও ওদের সঙ্গে ঘুর-ঘুর করে আর জ্বালানো তাতারস দু'এক বাটি খায়।

সময় এলো! পৌষপার্বণের আগের দিন বিকাল থেকে মরিয়া হয়ে কাজে লেগে গেলাম। ওরা নারকোল পর্যন্ত কুরিয়ে দিয়ে গেলো। রক্ষে মায়ের পিঠে করা দেখেছিলাম। ছেঁই-কাই করলাম। মুগডাল দিয়ে মুগ সামালীর কাই করলাম। এ সব মন্দ হলো না। মুশকিল হলো চুষি তৈরি নিয়ে। সারারাত হাতে কেটে কয়েকটা মাত্র চুষি তৈরি করলাম। আর পুলি করলাম একটি একটি বিরাট বড়। শুধু দুধে তাতারসে পুলি পিঠে হলো। আর মুগ সামালী ছোটো করে ভেজে ফেললাম কড়াই ভরা ডুবো তেলে। জিনিস-পত্তর যা নষ্ট করলাম!

সারা রাত ধরে পিঠে করে লোভীগুলোকে খাওয়ালাম ভয়ে-ভয়ে। কিন্তু প্রশংসা যা পেলাম। সারা জীবন আর কাউ খাইয়ে তা পাই নি।

পৌষ চলে গেলো। মাঘ এলো। ফাঁকা মাঠে নদীর হাওয়ায় শীত যা নামলো! লেপেও শীত মানায় না।

সকাল করে রান্না-বান্না করবার জন্য ভাঁড়ার বের করছি বিকেল বেলা। ঝুনঝুন মলের আওয়াজ পেলাম বাড়ির মধ্যে! চেয়ে দেখি দুটি ছোট-ছোট মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনে। বছর আষ্টেকের ওপর বয়স হবে না। দুটি মেয়েই সমবয়সী। একটি বেশ ফরসা। একটি কালো। মেয়ে দুটি বড় শান্ত, কোমল।

হুজনের বেশ-বাস চেহারা একই রকম। ফরসা মেয়েটি একটু রুচি সম্পন্না। মেয়েটির পরনে একটি কালো ফুলপাড় শাড়ি। হাতে হুটি রুপোর বালা। চুলগুলি উপরে টেনে বাঁধা। কালো মেয়েটির পরনে লাল ফুলপাড় শাড়ি। হাতে কয়েকটি কাঁচের চুড়ি। চুলগুলি খুব তেল দিয়ে পাটি পেড়ে বাঁধা। হু'জনের নাক বড় সুন্দর টিকোলো। চোখ হু'জনের একই রকম। হরিণী নয়ন, শান্ত কোমল ছল-ছলায়মান। মুখ হু'খানি ঢুলঢুলে। দেখলে মায়া লাগে। এখানে কোনো মেয়েদের আসতে দেখিনি। তাই আশ্চর্য হলাম।

মেয়ে হুটি আমার ঘরে এলো না। নামবার কাঠের সিঁড়ির হু'পাশে হু'জন বসলো। ওদের নাম জিজ্ঞাসা করলাম। ফরসা মেয়েটি উত্তর দিলো, আমার নাম আলেতম। আমার বাবার নাম আছিরদ্দি মাঝি। এ আমার বড় চাচার মেয়ে। ওর নাম জলেতম।

এতোক্ষণে ওদের চিনলাম। ওদের আর এক ছোট চাচাও আছে। হুটি বোন বড় শান্ত। আমার পিঠের গল্প করলো। ভালো পিঠে ওরা হু'বোনেই খেয়েছিলো।

আমার ছোট্ট বন্ধু হু'টিকে কি দিয়ে অভ্যর্থনা করি বুঝে পেলাম না। দিলাম একটু অগুরু মাখিয়ে। খেতে দিলাম এক রকম শসার মতো ফল ক্ষিরেই আর বাতাসা।

রোজ বিকেলবেলা হুটি বোনে এসে বসে আমার সিঁড়ির হু'পাশে। ওদের সঙ্গে কতো গল্প করি। খেতেও দিই কিছু-না-কিছু। আমার আলতা, সিঁদুর পরা, সাবান মাখা ওরা বসে-বসে দেখে। ওরা কি দিয়ে ভাত খেয়েছে জিজ্ঞাসা করলে জলেতম মুখ কাচুমাচু করে উত্তর দেয়, 'আমরা শুধু পেঁয়াজ-পোড়া, মরিচ -পোড়া দে ভাত খাই, ঠাইরোন'।

রোজই এক পেঁয়াজ-মরিচ-পোড়া শুনে যথেষ্ট পরিমাণ মাছ ও হরিণের মাংস দেওয়া হতো আছিরদ্দি মাঝিকে।

আমার ক্ষীণদেহা ছোট্ট বন্ধু দুটি রোজই আসে। খুব আস্তে আস্তে কথা বলে। ওদের বড় ভালো লেগেছিলো আমার। আজও স্নিগ্ধ-হাসিনী পুতুল দুটি আমার নয়নে-মনে ভেসে ওঠে।

কোনো দিন ডাব বাতাসা, কোনোদিন চিঁড়ে ভেজে গুড়ে ঢালা, কোনোদিন কমলা লেবু, দুধের সর তিন বন্ধুতে মিলে খাই।

একদিন এক মজার জিনিস খেলাম। বাড়িতে কার্তিক মাসে বাতাবি লেবু খেয়ে ছিলাম অনেক। তার দুটি বাতাবি কি ভাবে জানি আমার একটি ভাঙা বাক্সের ভিতর ছিলো, সেটা সঙ্গে এসে গেছে। কার্তিক, অঘ্রাণ, পৌষ, মাঘ ধরে লেবু দুটি শুকিয়ে রবারের বলের মতো হয়ে গেছে। একটুও পচেনি। শুধু খোসাটাই শুকিয়ে গেছে। লেবু দুটি কেটে তিন জনে খেলাম। বলতে গেলে বলতে হয়, অতো সুমিষ্ট লেবু জীবনেও খাইনি। মর্তের সুধা ফল শুকনো বাতাবি লেবু।

ধানসাগর আপিসে লোকজন কম। মাঝে-মাঝে পেট্রোল বাবু আসেন বোট নিয়ে। বোটে নদী-বনে থাকেন উনি। মাঝে-মাঝে আপিসে আসেন। দিব্যি হাসি-খুশি লোকটি। নাম হবিবর রহমান।

আর আসেন আর একজন। তিনি ফিউয়েলকুপের রেঞ্জারবাবু নীলকণ্ঠ সিংহ। প্রৌঢ় অতি অমায়িক ভদ্রলোক।

রেঞ্জারবাবু আসেন বড়ো মজার পথ দিয়ে। ভোলা নদীর ওপারে গভীর বনের মধ্যে দিয়ে দু'তিন মাইল হেঁটে আসেন। বনের মধ্যে পথ-ঘাট নেই। জঙ্গল ঠেলে-ঠেলে আসতে হয়।

বাঘের ভয়ও নেই ওঁর। ওপারে এসে ডাকা-ডাকি করতেন। আপিসের ডিঙিতে পার করে আনা হতো।

যাবার বেলা ওঁকে বনের পথে ছেড়ে দেওয়া হতো না। আপিসের ডিঙিতে যেতেন। সকাল থাকলে বনের মধ্যে দিয়েও যেতেন।

রেঞ্জারবাবু ছিলেন বিপত্নীক। অনেক বড়ো-বড়ো ছেলে-মেয়ে ছিলো ওঁর। একদিন হঠাৎ শোনা গেলো উনি খুলনায় একটি ছোটো মেয়ে বিয়ে করেছেন। অনেক নিন্দা মন্দ শোনা গেলো। সেই থেকে উনি আর কোনোদিন আসেন নি। সেকি লজ্জায়? না অধঃপাতে গেছেন বলে!

আর এসেছিলেন শরণখোলা থানার দারোগা। আপিসের চাপরাসী কাঠচুরির অভিযোগে থানার ডিঙি ধরে এনেছিলো, তাই একটা মিটমাট করতে। যতো বড় দারোগা হোক, সুন্দরবনের পাতাটাও হাত দেওয়ার জো নেই কারো।

মোচা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো তবুও যাদবের জ্বর সারলো না। স্বামী ওকে দেশে যাবার কথা বললেন। ও যেতে চাইলো না। সেখানে নাকি ওর সৎমা ওকে দেখতে পারে না। ওর বাবা গালাগালি করে।

একদিন ওর খুব জ্বর এসেছে। বোটম্যানরা বললো, ও কোন হাটে গিয়ে কতগুলি পাকা কলা আর তিনচার টালি কাঁচা দুধের দৈ খেয়েছে। সেই জন্য ওর জ্বর বেড়েছে।

স্বামী ওকে ডাকলেন সত্য মিথ্যা জানবার জন্য। আর যায় কোথায়! ও ভাবলো, ওকে মারধোর করা হবে। ও সেই জ্বর গায়ে একটা বালিশ মাথায় করে ঠিক দুপুরবেলা তেপান্তর মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলো।

বোটম্যানরা পিছু পিছু তাড়া করলো। ও ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে-কাঁদতে খাল ঝাঁপিয়ে বালিশ মাথায় করে পালিয়ে গেলো মোরেলগঞ্জের দিকে।

জামা-কাপড়, ওর সব জিনিসপত্তর ফেলে গেলো। এমন কি টাকা পর্যন্ত।

কি জানি, ওর ভূতুড়ে প্রকৃতি বুঝলাম না। ওকে কিছু খেতে দিলেও খেতো না। অথচ চুরি করে খেতে ও ভালবাসতো। রাত দুপুরে জ্বর কমে গেলে অন্ধকারে বসে ও ভাত খেতো। ভয় ভয়, কেমন-কেমন স্বভাব ছিলো ওর।

অনেকদিন ভেবেছি, ও সব ফেলে বালিশটা নিয়ে গেলো কেন? অসুস্থ মানুষের সম্বল ওই উপাধানটি—ওটাকে যেখানে সেখানে ফেলে একটু শুতে পারবে, এই হয়তো মনের আশা!

শরৎ নামে, একজন বোটম্যান এলো ওর জায়গায়। সেলিং কুপ থেকে কোন বাবু জানি পাঠিয়েছেন। লোকটি বুদ্ধিমান; সহিষ্ণু। ও সুন্দরবনে আগে কাজ করেছে।

ভোলার মাছ ওঠা কম পড়েছে। চাপরাসী-বোটম্যানরা পেট্রোল করতে যায়। যাবার বেলা কি এক রকম বড় বঁড়শী জোয়ারে নদীর ধারে গাছে বেঁধে রেখে যায়। আসবার সময় বিরাট ভেটকি নিয়ে আসে।

চৈত্রমাস পড়েছে। নদী-বন-প্রান্তরে এক রকম উদাস হাওয়া বইছে শন্‌শন্‌। ভালো লাগে না কিছু।

কয়েকদিন জলেতমের অসুখ। ওরা আসে না। স্বামী বাড়ির মধ্যে জটা বেগুন, ডাঁটার ক্ষেত করছিলেন নিজে। ওইগুলি তদারক করি। বেশ জটার মতো বেগুনগুলি ফলেছে। স্বামী সব সময়ই লেখা-পড়া করতেন। শারীরিক পরিশ্রম হয় না, তাই এই ক্ষেতের কাজ।

হঠাৎ একটি রৌদ্রতপ্ত দুপুরে আমার ছোট্টো বন্ধু জলেতম মারা গেলো। বড় ব্যথা পেয়েছিলাম সেদিন।

ওর মৃত্যুর কয়েকদিন পরে আলেতম এসে বসলো সিঁড়ির একটি পাশে। সিঁড়ির অপর পাশটি সেদিন ছিল শূন্য!

চৈত্র মাসে সুন্দরবনে বড় জলের কষ্ট। 'দুধনোনা' পুকুরের জল বেশ নোনা হয়ে উঠেছে।

মোরেলগঞ্জ থেকে জল আনতে দেরি হয়ে গেলো। তিন দিন শুধু ডাবের জল খেয়ে কাটালাম। জল অভাবে কলেরা লেগে গেছে।

একজন বাওয়ালির কলেরা হয়েছে। তাকে বন থেকে নিয়ে এলো। নদীর মধ্যে খোলা ডিঙিতে ছট্‌ফট্‌ করছে। স্বামী আমাকে বাওয়ালিটিকে দেখালেন। আপিস থেকে কিছু ওষুধ-পথ্য দিয়ে মোরেলগঞ্জে পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে আবার আদম-সুমারীর বছর পড়েছে। আপিসের অধীনস্থ বাওয়ালিদের গোনার ভাব বাবুদের ওপর। বাওয়ালিরা একমাস দু'মাস পরে যখন বাদা থেকে ফিরে পাস সই করে, সেই সময়ে ওদের গোনা হয়।

আপিস-সংলগ্ন ঘরেই আমি থাকি। ওদের সব কথাবার্তা শুনতে পাই। গুণবার সময় নাম, বাবার নাম, বাড়ি, জেলা, মাতৃভাষা। বাড়ি, জেলা, বাবার নাম, নিজের নাম ওরা ঠিকই বলতে জানে, মুশকিল হয় পেশা আর ভাষা নিয়ে!

জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার মাতৃভাষা কী? উত্তর হলো, 'হালুতি'। (হালুতি মানে হাল চাষ!) পেশা কী? উত্তর হলো, বাংলা! যিনি জিজ্ঞাসা করেন, তিনি ওদের পেশা, ভাষা সবই জানেন। তবুও এই কৌতুক-প্রিয়তাটুকু তাঁর যেন বড়ো ভালো লাগে।

ধানসাগর গ্রামের শের আলি সাহেবের বড়ো অসুখ। স্বামী গেলেন দেখতে। শুনলাম, নিউমোনিয়া।

এতো পয়সা আছে, কোনো ওষুধ-বিষুধ কিছুই নেই। ছেলেরা দেখছেও না। শের আলি ওঁর কাছে কতো দুঃখ জানালো। ছেলেরা যেন কেমন-কেমন! মোরেলগঞ্জ থেকে ডাক্তার আনতে বলা হলো। ওরা শুনেও শুনলো না।

কয়েক দিন পরে শের আলি মারা গেলো।

লোকটার জন্য মনে কষ্ট লাগলো। এতো পয়সা কড়ি, লোকজন থেকেও বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে মারা গেলো।

শের আলির শ্রাদ্ধের ভেট দিয়ে গেলো। স্বামী ভেট নিলেন না। ওর স্বার্থান্ধ ছেলেদের উপর বড় অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

চৈত্রমাসটি সুন্দরবনে বড় বিশ্রী লাগে। যতো মরা-ছাড়া। নদী বন প্রান্তরের মৃত্যু-উদাস হাওয়ায় বেদনাতুর মন কোথায় ভেসে যায়।

নীলের উপবাস করলাম। নানারকম ফল মূল, মিষ্টি ক্ষীর, লোভী মহম্মদ ও মেছের বোটম্যানকে খাওয়ালাম।

বৈশাখ এলো। শিবপুজো করবো। ভালো মাটি, ফুল বেলপাতা পাচ্ছিনে। শুনলাম, কোথায় বেতমোড় পুকুরে অপূর্বতম মাটি আছে। সেই মাটি দিয়ে এদেশের লোকেরা মুখ ধোয়। বেলপাতাও সেখানে পাওয়া যায়। ফুল বনের কেওড়া ফুল দিয়ে কাজ সারতে হবে।

মাটি, জল দুইই আনা হলো। জলও ভালো, সুমিষ্ট। মাটি এক আশ্চর্য জিনিস। সাদা দুধের মতো এঁটেল মাটি সুন্দর একটি গন্ধ। সেই বুড়িগোয়ালনীর কাশীর পুকুরের জল, বেতমোড়ের মাটি এই দুটি জিনিস ভুলবার নয়।

শ্রীশ বাবুর ওই চাকুরির ব্যাপারের পর থেকে সেন সাহেব শ্যেন পক্ষীই হয়ে উঠেছেন। সব সময় স্বামীর কাজের প্রতি নজর রাখেন। কোন্ সময় কি ভাবে আক্রমণ করতে পারেন সেই চেষ্টা।

সাহেবের স্টীমারের শব্দ পেলে সুন্দরবনের বাবুরা সরকারী পোষাক পরেন ও প্রস্তুত হয়ে থাকেন।

চুপে চুপে দূরে স্টীমার রেখে, ঠিক দুপুর বেলা জালি বোটে সেন সাহেব এসে হাজির। সবাই তখন বিশ্রাম করছে। সবাই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠলো।

কিন্তু কিভাবে জানি দু'আনা রেভিনিউ কম পড়লো। দু'আনা কম পড়াতে অনেক দিনের আক্রোশের সুযোগ মিলে গেলো। খারাপ রিপোর্ট লিখে রেখে গেলেন সেন সাহেব। আর মুখেও হেসে হেসে স্বামীকে বললেন, দু'আনা দিয়ে খুব বাজার করেছো নিশ্চয় !

এই সেন সাহেবটি অনেক লোকের চাকুরি নিয়ে নিজের স্বজনদের ঢুকিয়েছেন।

শরৎ জেটির বাসিন্দা কুম্ভীরনীর কয়েকটা ডিম এনে আমাকে দেখালো। দেখতে ঠিক রাজ হাঁসের ডিমের মতো। সেদিন কুমির গিন্নী আমাদের ওপর রাগ করেছিল নিশ্চয়। ওর দৈনন্দিন ঝগড়া ঝাঁটির জ্বালায় কোনটা রাগ, কোনটা আনন্দ বোঝবার জো'টি নেই !

আসলে কুমিরগিন্নী লোকটি কিন্তু ভালো। কাচ্চা-বাচ্চা, নাতি-নাতিন নিয়ে বেশ ঘর সংসার করে।

সুন্দরবনের নদীতে কামট আছে বেশ। একজনরা গোরু কিনে গাঙ্ পার করে নিয়ে যাচ্ছিলো। ওপারে যেয়ে দেখা গেলো কামটে গোরুর পেট চিরে দিয়েছে। শুধু রক্ত পড়ে পড়ে গোরুটি মারা গেলো !

কামটের বাচ্চাগুলি মাছের মতো কেটে এখানকার বাসিন্দারা খায়। বাচ্চা কামটগুলিকে বলে ফুল কামট।

আবার সুন্দরবনের নদীতে একরকম মজার জিনিস আছে।

ছোট কচ্ছপের মতো উপরের খোলা। পেটের মধ্যে শাঁস নেই। শুধু ফড়িংয়ের মতো পেটের ভেতর চারখানা পা। আবার তার একটা কাঠির মতো লেজও আছে। এদের বলে সাগর-কাঁকড়া। অবশ্য খাওয়া যায় না। সুন্দরবনের জলে-জঙ্গলে কতো রকমই জীবজন্তু বাস করে। কতো ভালো গাছ-পালাও আছে।

বেশ গরম পড়েছে। এখন আর তেমন কোনো মাছই পাওয়া যায় না বলতে হয়। তবে এক ব্যাপার হয়েছে। টক-সুদুঁর বনটার ওধারে জেলেদের খটি। খটি মানে এক রকম টোঙয়ের মতো ঘর। নিচে দিয়ে আগুনে মাছ শুঁটকি করে। বেশির ভাগ চিংড়ি মাছ। অবশ্য ছোটো, যাকে বলে নোনা চিংড়ি। এ মাছগুলি চালান যায় চট্টগ্রাম। আবার রৌদ্রে কিছু কিছু ছোটো মাছ শুকোয়।

সারা সুন্দরবন—নদীর ধার দিয়ে জেলেদের খটি। এরা আসে চিংড়ির সময়ে। খটিওয়ালাদের বাড়ি চাঁটগাঁয়ে। এরা বৌদ্ধধর্মী। 'অহিংসা পরম ধর্ম।' তাই জেলেদের দিয়ে মাছ ধরায়। অবশ্য পরের ধরা মাছ ওরা খুব খায়!

ওদের ওখান থেকে আমাদের প্রচুর মাছ দেয়। বাগদা চিংড়ি, কাঁকড়া, গুলে মাছই বেশি। আবার অন্যান্য মাছও আছে।

কিছু মাছ আলেতমদের বাড়ি পাঠাই। মাছ পেলে তখনই জলেতমের পেঁয়াজ-পোড়া, লঙ্কা-পোড়া দিয়ে ভাত খাওয়ার কাঁচু-মাচু মুখ মনে পড়ে!

একজন বাওয়ালি দু'টো টিয়ে পাখির বাচ্চা দিয়ে গেলো। তার একটা গেলো মরে। একটা রেখে দিলাম খালুইয়ের ভিতরে। বোটম্যানরা ওকে দুধ আর চাল খাওয়ায়। ও বেশ খায়দায়।

দিন কুড়ি-পঁচিশ আছে। একদিন ওকে বাইরের আলো-বাতাসে কতো বড়টি হয়েছে দেখবার জন্য ছেড়ে দিতে বললাম। যেমন ছেড়ে দেওয়া—ও উড়ে গেলো। বাঁদিকের খালটা পেরিয়ে বসলো বনকেওড়া গাছে। ওকে ধরবার জন্য চেষ্টা করতেই ও ভোলা নদী পেরিয়ে সবুজ টিয়ে বনসবুজে মিশে গেলো।

সুন্দরবনের নদীতে জোংড়া ও খুব পুরু, গোড়া-ঝিনুক পাওয়া যায়। ওই জোংড়া ঝিনুকে দালানগাঁথা চুন করে। আমাকে কতোগুলি বাওয়ালিরা ঝিনুক এনে দিয়েছিলো। পুরু, মসৃণ সুন্দর দেখতে ঝিনুকগুলি।

একদিন আমাদের একজন বোটম্যান নানা রকম চিনি এনে বললে, মা, কোন চিনিটা আমরা রাখবো ?

একটা খুব লাল, একটা আধ লাল, একটা খুব শাদা। আমি দেখে-শুনে লাল চিনিটাই রাখতে বললাম। ও হেসে উঠলো। এ চিনিগুলি আসলে চিনি নয়, মরা-ভোলানদীর চড়ার বালি।

সুন্দরবনে আপিস বিশেষ চাপরাসী, বোটম্যান, বাবুর সংখ্যা কম-বেশি থাকে। কোনো আপিসে দু'জন বাবু, চাপরাসী দু'জন, বোটম্যান মাঝি পাঁচ থেকে ছ-এর মধ্যে। বেশির ভাগ আপিসে তিনজন বোটম্যান, একজন মাঝি।

বুড়ী গোয়ালনী ছিলো রাখাল মাঝি। সাহেবখালি কালীচরণ। কবতক্ষের মাঝিদের নাম জানতাম না। নলগোড়ায় কান্ত মাঝি। এখানে তো আলেতমের বাবা আছিরদ্দি মাঝি।

হাওয়ায়-হাওয়ায় জেলের খটি থেকে ভেসে আসে কার জানি সুমধুর কণ্ঠস্বর অপূর্ব গান ও বাঁশীর সুর। কে জানি সারারাত বন-বাতাসের দোলায় মন-উদাস-করা বাঁশী বাজায় আর গান করে। সে অপূর্ব সুরে মন আকৃষ্ট করে, দূর-দূরান্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বেশ

স্পষ্ট শুনতে পাই যে গানটা ও গায়। সেই গান বাঁশীতে সুর তোলে। যে গান গায়, সে নাকি খটির মালিকদের ছেলে। সুগায়ক ছেলেটিকে দেখতে বড়ো কৌতূহল হয়।

এবার জ্যৈষ্ঠ মাসে আম প্রচুর। ঝাঁকা পুরে আম আনে মোরেলগঞ্জ থেকে। কাঁঠাল কেনা হলো ব্যাপারী নৌকা থেকে। ব্যাপারীরা কাঁঠাল কিনে এনেছে যশোর জেলার কেশবপুর থানার আল্‌তাপোল গ্রাম থেকে।

কতো ভালো যে লাগলো বিদেশে জন্মভূমির স্নেহ-মধুরস ভরা কাঁঠাল কোষগুলি! ওর মধ্যে পেলাম জননী জন্মভূমির স্নেহস্পর্শ।

দু'খানা—'হক' আর 'হেরিয়র' স্টীমারে এলেন সুন্দরবনের সেন সাহেব। আর কনজারভেটর ফেরিংটন সাহেব। সুদীর্ঘ গম্ভীর মানুষটি।

দুষ্ট বুদ্ধি সেন, মতলব করে স্বামীকে জব্দ করবার জন্যই সাহেবকে সঙ্গে করে এনেছে। সেনের কি আহ্লাদ, যেন গ্রাম্য পথে বৃষ্টি-ওঠা উজুসে কৈমাছটি। ছটফট্ ছটফট্ শুধু তম্বি!

ফেরিংটন সাহেবকে স্বামীর অপরাধের কথা বার বার সবিস্তারে বললেন সেন সাহেব। মনে হলো খুব মন দিয়ে সব কথা শুনছেন ফেরিংটন সাহেব। তার পর যা হলো, সে বড়ো মজা! ফেরিংটন সাহেব ইনস্‌পেকসনবুকে, স্বামীর কাজ-কর্মের খুব ভালোই রিপোর্ট লিখে গেলেন।

এখন উনুনের ওপর কাঁটা-বেঁধা মোচাটি দেখে যাদবের কথা মনে পড়ে। কোথায় আছে জানি মাতৃহারা, অসুস্থ, একটু বোকা ছেলেটি!

আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘ জমলো ভোলার ওপারে বনের মাথায়। মেঘ গুরু-গুরু, দুম-দাম কড়াৎ-কড়, বৃষ্টি নামে। কালো মেঘ চিরে বিদ্যুৎ চমকায় বনের মাথায়।

বর্ষায় সুন্দরবন অপূর্ব শ্রীময়ী। পাতায়-লতায়, নদীর জলে, বনে-প্রান্তরে পূর্ণতার আভাস। দিনে-দিনে রূপসী হয়ে ওঠে বনশ্রী।

জীবধরা আপিসের বাবু এলেন হরিশঙ্কর তরফদার। সেই কবতক্ষ আপিসের ভূপালবাবুর ভাইপো।

এখানেও ভূপালবাবুর মেয়ে বিশা ঠাকুরঝি আমায় চিঠি দিতো। হরিশঙ্করবাবু আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। সেদিন নিমন্ত্রণ সেরে ফিরেছিলাম শেষ রাতের জোয়ারী বাতাসে গা এলিয়ে। শেষ নিশার স্তব্ধ, মৌন সুন্দরবনকে দেখেছিলাম এক নতুন রূপে। হরিশঙ্করবাবুরাও এসেছিলেন আমাদের এখানে। খুব খুশি হলেন আমাদের ডাঁটা-ক্ষেত, জটা-বেগুন দেখে।

খটির ছেলেটি বাঁশী বাজায়, গান করে ঃ

কাঁহা জীবন ধন, বৃন্দাবন
কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা,
শূন্য হৃদয়-পুরী, আও আও মুরারী,
মোহন বাঁশরী বাজা··

কোন অতীত যুগের বিধুরা কোন গোপ বধূর আকূতি ওই গানের মূর্ছনায়, বাঁশীর সুরে।

শ্রাবণের ঘনায়মান মেঘের কোলে বনের মাথায় শাদা পাখি ওড়ে। ছিট্ ছিট্ বৃষ্টি, দমকা বাতাসের সাথে মেশা। নদীতে উচ্ছ্বসিত ভোলার ঘোলা জল আর হু-হু দমকা বাতাস। জলো উদাস বাতাসে নৌকার পাল ওড়ে। ঘরে মশারী ওড়ে। শাড়ির আঁচল ওড়ে। আর ওড়ে মানুষের মন—যুগ-যুগান্ত, দূর-দূরান্ত পেরিয়ে বিধুরা গোপবধূর আকুলি-বিকুলি, হাহাকার, কান্নাভরা বাঁশীর সুর ঃ

শূন্য হৃদয়-পুরী, আও-আও মুরারী···

শ্রাবণের ভারাক্রান্ত বনের মাথায় মেঘ ঝ'রে পড়ে বেদনাতুর গানের সুরে।

প্রভাতের উচ্ছ্বসিত আনন্দ-গান করে ছেলেটি। দীপ্ত মধ্যাহ্নে আলোর গান করে। ধূসর সন্ধ্যায় সাঁঝ-পূরবীর বন্দনা করে :

আর নাই রে বেলা, চলরে ঘাটে,
কলসখানি ভরে নিতে।

সুগায়ক ছেলেটিকে নিয়ে মন নানা জল্পনা-কল্পনা করে। ওকে যেন কেমন রসস্যময় লাগে। ওকে দেখবার একটা অদম্য কৌতূহলও পোষণ করি।

একদিন সুযোগও এলো ওকে দেখবার। আপিসে একদিন হরির লুট হলো। কয়েকজন কীর্তনিয়া গান করলো। আর একজন ছড়াকার ছড়া কাটলো। ছড়াকার লোকটি একেবারেই নিরক্ষর। কিন্তু আশ্চর্য! তাকে যাই বলা যায়, সে অমনি সুন্দর ছড়া তৈরি করে। একটুও অমিল হয় না। মানেও ঠিক হয়। সারা জীবন ধরে মানুষে যা পারে না ও মূর্খ নিরক্ষর মানুষটি কি করে তা পারলো অবাক্ হয়ে ভাবি।

ছড়াকার একজন কাঠ-কাটা বাওয়ালি। আর কীর্তনিয়াদের বাড়ি নিকটের গ্রামে। কীর্তনের আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে এলো খটির গায়ক বাঁশীওয়ালা ছেলেটি।

এতোদিন যাকে কতো কল্পনার রঙে অপরূপ রহস্যময় ভেবেছি, আজ বলিষ্ঠ গাঁট্টাগোট্টা, মুখ গোল, নাক চেপটা কালো ছেলেটিকে দেখে, আমার কল্পনার সৌধ ভেঙে পড়লো। ও বাঁশী বাজালো, গান গাইলো—আমি কিন্তু তেমন ভালো শুনলাম না। কতো গভীর রাত্রে বন-বাতাসে, নদীর কল-সুরে ওর গান আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতো কোন দুরান্ত পারে। ওকে দেখার পর থেকে বাঁশী-গান আমার কানে একঘেয়ে হয়ে গেলো। আর তেমন ভালো লাগে না।

শ্রাবণে শূন্য প্রান্তর সবুজ ধানে ভরে গেলো। আলেতমদের বাড়িখানির চারদিকে ধানগাছে ঘেরা। বেশ দেখতে। ওপারে দূর-দূরান্ত প্রসারী বর্ষাপুষ্ট সুন্দরবন। মাঝখানে বর্ষা-উচ্ছ্বসিত ভোলা। এপারে সীমাহীন সবুজ সমুদ্র-ধান ক্ষেত। কতো মানুষের আশা-ভরসা ওই কচি নধর বাতাসের দোলা-লাগা ধানগাছগুলিতে।

মেঘাচ্ছন্ন দিন। কালো মেঘ জমেছে বনের মাথায়। বেলা একটা কি ছ'টো হবে। চারিদিকে একটা হৈহৈ শব্দ শুনতে পেলাম। কারা জানি ক্যানেস্তারা পিটোচ্ছে। ছোট্ট আলেতম ছুটে এসে আমায় বললো ; ঠাইরোন, ধানক্ষেতে বাঁওড়ের পাখিরা এসেছে, দেখো। আমাদের সব ধান গাছ বাঁওড়ের পাখিরা নষ্ট করে দিয়েছে।

একরকম ফড়িং নাকি ঝাঁকে ঝাঁকে ধান পাতা খেতে আসে। আর পাখিরা আসে তাদের ধ'রে খেতে। মধ্য থেকে ধানের শেষ !

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আরও আশ্চর্য লাগলো ওদের এক নিমেষে উড়ে যাওয়া দেখে। সারা আকাশ ছেয়ে ঝট্‌পট্ পাখা নেড়ে শাঁ-শাঁ শব্দ করে ওপারে বনের মাথায় মিলিয়ে গেলো।

রং বে-রঙের পাখিদের কী সুন্দর দেখতে! ওরা নাকি থাকে বনের মধ্যে বাঁওড়ে। সুন্দরবনের জলাজমিতে জোয়ারী জল বেঁধে সেখানে পদ্ম পাতা নাল ফুল ফোটে। বাঁওড়ের জলের মধ্যে অনেক রকম গাছ। সেখানে ওরা বাঘের ভয়ে বাসা বেঁধে বাস করে। মাঝে মাঝে আসে বাইরে চরতে। তারই একটি বিশেষ অবস্থা।

শেষ শ্রাবণে বৃষ্টি নামলো। যাকে বলে ধারা-শ্রাবণ। গুম-গুম শব্দে মেঘ ডাকছে, সঙ্গে দমকা বাতাস। সবাই বলছে বন্যার লক্ষণ। আমার ঘরের কাঠের পাটাতনের নিচে ছ'তিন হাত জল

উঠলো। কর্কট শিশুরা আমার ঘরে উঠতে শুরু করেছে। নানা রকমের সাপ-মাছেরা কিলবিল, হিলহিল করে বেড়াচ্ছে।

হাট-ঘাট বন্ধ। জেলের খটির বাগ্‌দা চিংড়ি সম্বল। সব থেকে মুশকিল হয়েছে ধান সাগরের লোকদের। মাচার ওপর, নয়, শের আলির টিনের দোতলায় দিন গুজরান করছে।

আমাদের ঘাটের কুমির বৌ, সসন্তান স্বামীসহ খোস মেজাজে ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছে। কুমির পরিবার কারও কোন ক্ষতি করছে না। জলোচ্ছ্বাসে ওরা নিজেরাই মাতোয়ারা।

কয়েকদিন পরে জল কমে দু'হাত হলো।

শেষ শ্রাবণের কোনো একটি দিনে বিদায় নিলাম। নদী তখন জলময়ী। বনভূমি পল্লবপূর্ণা। আকাশে তখন নতুন রঙের সূচনা। বাতাসে শরতের বন্দনা, প্রান্তরে ধানের ঢেউ। আমি বিদায় নিলাম আমার কৈশোর সঙ্গিনী শ্যামা বনভূমির কাছে।

আমার শরীর অসুস্থ। দেশ থেকে আমার দেওর এলো আমাকে নিয়ে যেতে। স্বামীও দশদিন ছুটি নিলেন আমাদের সঙ্গে যাবেন বলে। ছুটি মঞ্জুর হয়ে এলো।

সবার কাছে বিদায় নিলাম। মেছের বার বার করে বললো, আমি সত্যিই ওদের মা, তাই অমনি আন্তরিক যত্নে ওদের খোঁজ-খবর করতাম।

যাবার আগের দিন ছোট্টো পুতুল বন্ধু আলেতম এসে বসলো সিঁড়ির একটি পাশে। বললাম, আলেতম, চলি ভাই! বড় হয়ে আমার কথা মনে করো।

ওতো আমায় যেতে দিতেই চায় না। বললো, তুমি শিগগির ফিরে এসো, ঠাইরোন।

বেদনাতুর মনে আলেতমের বসবার সিঁড়ির পাশে হাত রেখে

বললাম, আলেতম, বিদায় দাও, ভাই। ধানসাগর কাছারি থেকে আনা রজনীগন্ধা ফুলের তোড়াটি দিলাম জলেতমের কবরে দিতে।

আলেতম বললো, চলো ঠাইরোন, তুমি নিজেই ওর কবরে ফুল দেবে।

সুন্দরবনের বাবুদের বৌ কোনো সময় বাড়ির মধ্যে থেকে বার হয় না। পালিয়ে গেলাম রান্নাঘরের পিছনের দরজা দিয়ে। ওদের ঘরের বড় ঘরের পিছনে বন-কেওড়া গাছ তলায় জলেতমের ছোটো কবরটি। পরিচ্ছন্ন লেপা-পোঁছা। একটি নিবন্ত প্রদীপ কবরটির 'পরে, একটি নতুন মাটির ঘট।

আমি আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলাম কবর। সুগন্ধী রজনীগন্ধার তোড়াটি রাখলাম কববের ওপর। আর রাখলাম, অনেক দিনের ব্যথায় জমা কয়েক ফোঁটা চোখের জল।

আমি উঠে দাঁড়াতেই একজন আমাকে জড়িয়ে ধরলো। অবিকল জলেতম! শুধু যা বড়। মুখের আদল, রং, কপালের তিলটি পর্যন্ত। বুঝলাম জলেতমের মা আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, আর শ্রাবণের মেঘ-ঝরা-অশ্রু ঝ'রে পড়ছে আমার মাথায়।

আর একজনও সজল চোখে আমার হাত ধরলেন। বুঝলাম, আলেতমের মা। ইনিও আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

আশ্চর্য, মা দু'টিকে দেখতে মেয়ে দু'টিরই মতো। আবার আলেতম-জলেতমের মা দুটি এক রকম দেখতে। কেবল একজন কালো, একজন ফর্সা। পরে শুনেছিলাম, আলেতম-জলেতমের মা দুই সহোদরা।

এতদিন দূর থেকে এদের কাজ দেখতাম। ওরা হয়তো আমায় জানতো। এই দেখা শোনার মধ্য দিয়ে অনেকখানি আপন হয়ে ছিলাম এঁদের, বুঝলাম সেদিন।

জলেতমের মা আমায় ঘরে বসালেন। একখানি ছোট ডালায় কয়েকটা কাপড় পরানো মাটির পুতুল। আমার দেওয়া একটুকরো সাবান। ছোটো-ছোটো দু'টি শিশিতে গন্ধতেল ও আলতা কতো যত্নে জলেতম গুছিয়ে রেখেছিলো! ওর ছোট ফুল-পাড় শাড়িখানি বাঁশের আলনায় সযত্নে তোলা। সব কিছুর মধ্যে যেন জলেতমের ছোঁয়া!

সজল চোখে, ভারাক্রান্ত মনে নীরবেই ফিরলাম। আকাশে তখন শ্রাবণ মেঘ ঘনায়মান। ভোলার বুকে কালো মেঘের ছায়া। নীরব, নিথর সন্ধ্যার ধূসর প্রলেপ, বনে, প্রান্তরে।

একদিন খুব ভোরে আমরা রওনা হলাম। ধানসাগর গ্রামের শেষ সীমানায় খালধারে নারকেল-খেজুর বাগানে ঘেরা শের আলি সাহেবের টিনের দোতলা বাড়ি। তার কাঁটা ঘেরা পুকুর ধারে শের আলির ইঁটের গাঁথা ছোট্ট কবরটি দেখলাম।

আপিসের ডিঙিতে যাচ্ছি মোরেলগঞ্জ। সেখান থেকে স্টীমারে যেতে হবে। প্রতিকূল বাতাসে নৌকা এগোতে পারছে না। খাল ভরতি গোল-পাড়া শিঙড়ে কাঠ বোঝাই বাওয়ালি-নৌকা। বড়ো-বড়ো হাপর বাঁধা জেলে নৌকাও আটকে পড়ে আছে। বাতাস তখন কমে গেছে। একবার বৃষ্টি একবার রৌদ্র হচ্ছে।

খাল পেরিয়ে ভৈরব নদীতে পড়লো। বনের সীমানা ছেড়ে গেছে।

মোরেলগঞ্জ পৌঁছে গেলাম। হাসি-কান্নার মতো রৌদ্র জলময় অপরাহ্ণে স্টীমার ছাড়লো বাগেরহাটের উদ্দেশ্যে।

স্টীমার দূরে দূরে নদীর বুকে স'রে যাচ্ছে। তীরের রৌদ্র-জলস্নাত নারকোল গাছগুলি ঝিল্‌মিল্ করে মাথা নেড়ে-নেড়ে বিদায়-অভিনন্দন জানালো!

আজ আর মন টেলিগ্রাফের তার বেয়ে ফিরে এলো না, চলে গেলো দূরে—দূরে। ডাইনে ধানসাগর আপিস হয়ে শরণ খোলা ফরেস্ট আপিস দিয়ে, বলেশ্বর বেয়ে সাত-নদীর মোহানায় সৌলার পারে সুপতি ফরেস্ট আপিসে। তারপর? তারপর হরিণঘাটার কাশ বনের মধ্য দিয়ে, নীল কমল তীর্থ ঘুরে, আবার ভোলা পেরিয়ে, ধানসাগরের বাঁয়ে জীবনধারা ফরেস্ট অপিস ঘুরে সেই খড়মা নদীর ধারে উন্মুক্ত প্রান্তরে চাঁদপাই ফরেস্ট অপিসে সরলা মিতিনের কাছে।

তারপর? তারপর, মন আর ফেরেনি। সুন্দরবনের বনে-প্রান্তরে, শ্যাম ছায়ায়, ঘন সবুজের নীলে, লতা-পুষ্পে, কেয়ার পরাগে, ঝাউয়ের দোলায়, পশোর নদীর উদাসী ধু-ধু হাওয়ায় ঘুরে মরে আজো।

কোনো একটা কিছু, ঘটতে বেশি সময় লাগে না। আমরা আসবার সময় যেদিন ধানসাগর খালের মধ্যে আটকে ছিলাম, সেইদিনই সেন সাহেব তাঁর শিকারের লক্ষ্য স্বামীর মুণ্ডপাত করে গেছেন। স্বামীকে সাস্‌পেণ্ড করা হয়েছে চাকুরি থেকে।

তাঁর অপরাধ 'দু' আনা রেভিনিউ কমতি। অবশ্য তাতে কিছুই হতো না, হলো সকাল পাঁচটায় রওনা হয়ে স্বামী লিখে এসেছিলেন আটটা। মাত্র আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট আগে এসে সেন সাহেব তাঁর অনেক দিনের ইচ্ছা পূর্ণ করলেন।

বিচার হয়ে স্বামীর চাকুরি গেলো। কিন্তু আপিল করে আবার চাকুরি পাওয়া গেলো। স্বামী ছুটিতে থাকলেন অনেক দিন। প্রায় বছর দুই পরে আবার কাজে যোগ দিলেন। সেন ওঁকে বদালী করলেন সেই সাত-নদী পারে সুপতি আপিসে, দিনে যেখানে বাঘ চরে।

সুন্দরবনের শাস্তি, বাবুদের পরে রাগ থাকলে সুপতি আপিসে

বদলী করা। আর সাহেব খুশি থাকলে কলকাতা 'নারকেল-ডাঙা'য় বদলী করা।

সেন সাহেব আবার সুযোগ পেলেন। স্বামীর খুব অসুখ। সেই সময় সুপতির বাড়িঘর মেরামত চলছে। উনি নিজে কিছু দেখতে-শুনতে পারছেন না। অসুখের জন্য ছুটি চেয়েও মঞ্জুর হয়নি। সেন এলেন বাড়ি-ঘর মেরামত দেখতে। কোন ত্রুটি না-পাওয়ায় চালার গোল-পাতা গুণতে শুরু করলেন। ছ'পণ গোল-পাতা কম পড়লো। মাত্র ছ'পণ গোল-পাতা—কাহন-কাহনকে গোল-পাতা পচে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। তুচ্ছ ব্যাপারে আবার স্বামীর চাকুরি গেলো। শ্রীশবাবুর উপকার করার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হলো। স্বামী অসুস্থ শরীরে ভেঙে পড়লেন।

তারপর মাত্র কয়েক মাস পরেই সেন সাহেব পৃথিবীর সাহেবীয়ানা ত্যাগ করে স্বর্গের দিকে রওনা হলেন। সেন সাহেব মরবার আগে শুধু নাকি শরীরের জ্বালায় কষ্ট পেয়েছেন। স্বামী সারা জীবন ধরে দুঃখে সান্ত্বনা পেয়েছেন এই ব'লে-ব'লে,—বহু লোকের রুটি মারবার পাপেই অমনি জ্বলে মরে গেলো!

তারপর? তারপর, যুগ-যুগান্তর, বর্ষা বসন্ত, শীত হেমন্ত, দিন-দিনান্ত, বর্ষমাস, দিন রাত্রি পেরিয়ে আজ পৌঁছে গেছি আর একটি জীবনে। এখানে অনেক দুঃখ, ক্লেশ, ঘাত-প্রতিঘাত, নিরুপায়তা, বহু দৈন্য যন্ত্রণা-ভরা দিবসের শেষে স্মৃতির নয়নে ফুটে ওঠে কৈশোর বেলার প্রাচুর্য-সুন্দর দিনের স্বপ্ন। সুশ্যাম বনজ সৌগন্ধ এখনও আলায় আকুল করে।

আর যাইনি সুন্দর বনে।

স্মরণে

স্মৃতির পার থেকে ফিরে এসো তুমি শ্যাম গম্ভীর অরণ্যানী !

মনে পড়ে বনবধূর বনমায়া ঘেরা অর্ধ নিমীলিত অন্তিম আঁখিদুটি। ফিরে এসো বান্ধবী ! দুর্গম পথের সহযাত্রিণী 'ওনা' ! ফিরে এসো 'আলেতম-জলেতম' প্রিয় বন্ধু দুটি !

ফিরে এসো 'সরলা মিতিন' ! আর ফিরে এসো পিতৃসম 'অক্ষয়' অফুরন্ত স্নেহ-মধু নিয়ে। আর ফিরে এসো সুন্দরবনের কানন-প্রান্তর, আকাশ-বাতাস, লতা-পাতা, সাপ-বাঘ, মাছ-পাখি, ফুল নদী ! ফিরে এসো তুমি কৈশোর-স্বপ্নে উদ্ভাসিত, স্মৃতির রঙে রাঙানো শান্ত শ্যামল সুন্দরবন ! উত্তাল তরঙ্গায়িত, ভয়াল রহস্যময় 'সাত-নদীর মোহানা !

তুমি ফিরে এসো, সখি, মায়ায় ছায়ায় বনবাতাসে দোলায়িতা স্নিগ্ধা 'সোলা' !

ফিরে এসো তোমরা আমার নয়নে, মনে, গোপনে।

আর তুমি ফিরে এসো, আমার ব্যথা-বেদনায়, সুখে-শোচনায়, দুঃখে-রচনায় মরণের পার থেকে, সহযাত্রি !

———